শ্রীহিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
১৩৩১

মূল্য দেড় টাকা।

উৎসর্গ।

নিয়ত যাঁহার পবিত্র নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করি, যাঁহার চরিত্র-গৌরব মহৎ আদর্শরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আমার সেই পরমারাধ্য পিতামহদেব স্বর্গীয় রাজ-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিউদ্দেশ্যে এই সামান্য অর্ঘ্য, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত অর্পিত হইল।

নৈবেদ্য।

আজ সৌভাগ্যবশতঃ বাণী বীণাপাণিকে নানা কৃতী লেখক নিত্য নূতন ভূষণে অলঙ্কৃত করিতেছেন; তাহা বলিয়া পূজা-মন্দিরে দীন হীন লেখকের কি প্রবেশাধিকার নাই? যেখানে চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইতেছে 'সেখানে কি জোনাকীরা ঝিকিমিকি করে না?' এই ভরসায় অকৃতী হইলেও শ্রদ্ধাভরে পূজা অর্ঘ্য লইয়া বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

আমার সাধনা কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। ইতি—

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৩১।

বিনীত—
শ্রীহিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণের আগ্রহাতিশয্যে এবং দূরবস্থিত প্রশংসনীয় মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা মুদ্রাঙ্কন সত্বর শেষ করিবার অভিপ্রায়ে অল্প সময়ের মধ্যে প্রুফ্-সিট্ দেখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি হওয়ার সম্ভব, তজ্জন্য আমরা সম্পূর্ণ দায়ী।

দি বেঙ্গল রাজমোহন লাইব্রেরী,
নারায়ণগঞ্জ।
১৮ই বৈশাখ ১৩৩১ সন।

বিনীত নিবেদক—
চাটার্জ্জী ব্রাদার্স্।
প্রকাশক।

অন্তিমে-"মা"।

প্রথম অধ্যায়।

সম্বলপুর জিলায় নিশ্চিন্তপুর পরগণায় গঙ্গারামপুর একটী গণ্ডগ্রাম। বড় বেশী দিনের কথা নয় তথায় শিশিরচন্দ্র ঘোষ নামে গৌরকান্তি, নাতিদীর্ঘ, পরদুঃখকাতর অতি সম্ভ্রান্ত এক বৃদ্ধ বাস করিতেন। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তিনি সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বাড়ীখানা এরূপভাবে সাজাইয়াছিলেন যে দেখিলেই নয়নমন সার্থক হইত; কাহারো কাহারো মনে ঈর্ষার সঞ্চার যে না হইত তাও নয়।

পাঠক! আপনিও যদি বাড়ীটী একবার দেখিতেন তা'হলে আপনার মনেও ঐরূপ ভাব নিশ্চিতই জাগিয়া উঠিত। আহা! এরূপ একখানা বাড়ী যদি আমার থাকিতো তবে আমি কত সুখী হইতাম, আপনার মনে এবম্বিধ ভাব নিশ্চিতই উদিত হইত

সন্দেহ নাই। উত্তরে পুকুর, দক্ষিণে পুকুর, মাঝখানে বাড়ী, পূর্ব্বদিকে যুঁই, বেলা, কামিনী, হেনা, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের বাগান; পশ্চিমে আঁব, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি অনেক রকম সুস্বাদু ফলের গাছ। পুকুর-পারে কদলি-বৃক্ষরাজি কোনটী বা ফলভরে, কোনটী বা মোচার ভারে—জানিনা কাহার আশায় বা প্রতীক্ষায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত মানসেই যেন অবনত হইয়া রহিয়াছে। পুকুরের জলগুলি নির্ম্মল স্ফটিকবৎ। এমন পরিষ্কার যে, চাহিলে পুকুরের তলদেশের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হয়। শাদা, কাল, বেগুণি, লাল অথবা এই কতিপয় বর্ণের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বর্ণের মৎস্যগুলি যে এদিক ওদিক সন্তরণ করিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া বহিয়া শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত ঘাটে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের অন্তর হইতে দুঃখরাশি কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্হিত করিয়া দেয়। বাড়ীটীর চতুষ্পার্শ্বে খেঁজুর বৃক্ষের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই প্রাচীর হইতে অনুমান তিন হাত দূরে সুপারী বৃক্ষের কাতার বা শ্রেণী, দেখিলেই মনে হয় যেন উহারা কে কাহার অগ্রে গগন স্পর্শ করিবে প্রতিনিয়ত এরূপই চেষ্টা করিতেছে। দক্ষিণদিক হইতে বাটী প্রবেশ পথে উভয় পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ তালগাছ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যেন দণ্ডায়মান আছে বলিয়া মনে হয়। এই তালগাছের পদতলে দুইটী কদলি-বৃক্ষ মনোহর তোড়ণদ্বারের অভাব পূরণ করিতেছে; এতদ্ভিন্ন বাটীর

ভিতরে স্থানে স্থানে লাউ, কুমড়া, শশা, পটোল, ডাঁটা ইত্যাদি যখন যে তরকারীর প্রয়োজন, ঘোষ মহাশয় নিজে খাঁটিয়া খাঁটিয়া তাহাই জন্মাইয়া লইতেন। পুকুরের মাছ, বাগানের ফল, বাগানের তরিতরকারী, বাগানের ফুল কোনটারই অভাব ছিল না। চাল, ডাল, তৈল ইত্যাদি জীবনধারণ পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই বাটীর ফলাদি-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে সঙ্কুলান হইত কিন্তু ধন, জন, জীবন, যৌবন কাহারো চির-সম্পত্তি নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়া কেহই পৃথিবীতে আসে না।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ ভগবানেরই বিধান। আমাদের এই ঘোষ মহাশয়ও এই বিধান মানিয়া চলিতে নিয়ত বাধ্য। এক দিন একান্তে বসিয়া ঈশ্বরের এই বিধানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি অকস্মাৎ এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তদীয় লক্ষ্মীস্বরূপিনী স্ত্রী সবে একবৎসর যাবৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দশম বর্ষীয়া কন্যা, সপ্তমবর্ষীয় পুত্র রমেশ ও তিন বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র দীনেশ কোনরূপে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগজনিত শোকাপনয়ন করিয়া আসিতেছিল। আজ অকস্মাৎ গৃহলক্ষ্মীর মুখশ্রী ও কার্য্যকলাপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি এক সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের কষ্ট জ্ঞাপন করিলেন। আবার অমনি ভাবিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী যেন তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। অহো! কি অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ প্রেম! অহো! কি

মধুর ভালবাসা! কি সুমধুর স্মৃতি! কত দিনে তিনি পরলোকে সহধর্ম্মিণীর সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন, কত দিনে তিনি তাহার নিকট এতদিনের বিচ্ছেদ-যাতনা হৃদয় খুলিয়া, মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিবেন, দিবানিশি তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। কখন কি হয় এই ভাবিয়া হঠাৎ এক দিন সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া ফেলিলেন। উইলের মর্ম্ম এইরূপ হইল যে তদীয় মৃত্যুর পর সাধের কন্যা শান্তি বাটীর অর্দ্ধাংশ পাইবে এবং রমেশ ও দীনেশ অপরার্দ্ধের মালিক হইবে।
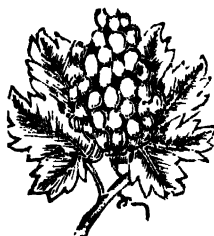
দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঘোষ মহাশয় উইল করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি তাঁহার কন্যা শান্তির ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির নিমিত্ত অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কিরূপে কোথায় শান্তিকে সৎপাত্রস্থ করিবেন অহর্নিশ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এ সকলি তো বিধিরই নির্ব্বন্ধ, তবে আর বৃথা চিন্তা কেন? এইরূপও অপরাপর বিবিধ চিন্তায় তিনি নিবিষ্ট আছেন এমন সময় তাঁহার বাল্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসু মহাশয় আসিয়া সমীপস্থ হইলেন। অনেক দিন যাবৎ উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নাই, আলাপ-ব্যবহার নাই, এমন কি পত্রের আদান প্রদানও নাই কিন্তু বহুদিন পরে হঠাৎ এই শুভ-সন্মিলনে উভয়ের মনে কেমন এক প্রকার ভাব জাগিয়া উঠিল যে তাহা বাক্যের অতীত, ভাবনারও অতীত, লেখনীরও শক্তি নাই তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারে। প্রথম দর্শনমাত্রে উভয়েই নির্ব্বাক, নিষ্পন্দ, চক্ষুর পাতাটীরও যেন সঞ্চালন-শক্তি রহিত হইল। নির্ব্বাক-নিষ্পন্দভাবে, অনিমেষ লোচনে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বা প্রেমাশ্রু যাহাই বলুন বিগলিত ধারায় নিপতিত হইতে লাগিল। জোয়ারের জল যেমন বাঁধ অতিক্রম করিয়া সবেগে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হয়, তেমনি ধারায় যেন উভয়ের আনন্দাশ্রু বা প্রেমাশ্রু

বিগলিত হইতে লাগিল, অথবা ভাদরের বন্যা যেমন সকল দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলে এই আনন্দাশ্রু বা প্রেমাশ্রু ও ঠিক তেমনি গণ্ডদেশ, বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়া, পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়া পাদদেশ চুম্বন করিতে লাগিল। যিনি প্রকৃত প্রেমিক, কেবল তিনিই এইরূপ পবিত্র প্রেমের মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারেন, অপরের সাধ্য নাই এইরূপ প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। কবি নানারূপ কল্পনা করিতে পারেন, ভাবুক নানারূপ ভাবিতে পারেন কিন্তু এইরূপ অভিনব প্রেম তাঁহাদের কল্পনা ও ভাবনার অতীত, সুদক্ষ চিত্রকরও এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহেন। কবি কল্পনা করিতে পারেন, ভাবুক ভাবিতে পারেন, চিত্রকরের তুলিকা নিঃসৃত চিত্র লোকের নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, কিন্তু কখনো প্রকৃত প্রেমিক হইতে পারে কি ? পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কখনো যদি এমন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে তবে তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের তৎকালীন অবস্থাটী সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাহাহউক এবম্বিধ অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। ঘোষ মহাশয় আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়া বসু মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—ভায়া ! এতকাল পরে বুঝি আমাকে মনে পড়িয়াছে !

বসু মহাশয়—একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন তবুতো আমি মনে করিয়াছি, শুধু মনে করি নাই—আসিয়াছি। তুমি তো ঘুণাক্ষরে একটীবারও আমাকে মনে কর নাই ?

ঘোষ মহাশয়—হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমি মনে না করিলে তুমি হঠাৎ এতদিন পরে কেমন করিয়া এখানে আসিলে? যে যাকে ভাবে সে তাকেই পায়। আমি তোমাকে মনে করিয়াছি বলিয়াই তুমি এখানে আসিয়াছ।

উভয়ের হাসি—হো! হো! হো!

কিয়ৎকাল এইরূপ ও অপরাপর হাসি তামাসায় অতিবাহিত হইলে পর বসু মহাশয় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাকান্তের সহিত ঘোষ মহাশয়ের কন্যা "শান্তির" বিবাহের কথা পাড়িলেন। উভয়ের সম্মতিক্রমে তদ্দণ্ডেই বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল। পঞ্জিকা আলোচনা করিয়া ২৭শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার গোধূলি-লগ্নে বিবাহ হইবে সাব্যস্ত হইল। বিবাহের মাত্র পনর দিন বাকী আছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সমাধা করিতে হইবে, এবম্বিধ চিন্তা উভয়ের মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহাহউক, মধ্যাহ্নাহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম সুখ উপলব্ধি করার পর বসু মহাশয় গঙ্গারামপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী স্বীয় বাস-ভবন রাজমোহনপুরাভিমুখে দ্রুতপদবিক্ষেপে রওনা হইলেন। এদিকে শিশির বাবুও নিরস্ত রহিলেন না, কন্যার বিবাহোপলক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমস্ত সত্বর সংগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। দেখিতে দেখিতে বিবাহ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। শুভদিনে শুভলগ্নে, মহাসমারোহে শান্তি ও শ্যামাকান্তের উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

আজ শিশিরবাবু ও রামচন্দ্রবাবুর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। বস্তুতঃ উভয়েব বাল্যপ্রেম যেন এই উপলক্ষে দ্বিগুণ হইয়া জাগিয়া উঠিল। নানারূপ আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া সময় যেন অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতে লাগিল। সুখের সময় এইরূপেই যায় বটে। অতঃপর রামচন্দ্রবাবু পুত্র শ্যামাকান্ত ও পুত্রবধূ শান্তিকে নিয়া মহাজাকজমকের সহিত বাড়ী চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাড়ী পোঁছিয়া কতিপয় দিবস সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইলে পর হঠাৎ একদিন রামচন্দ্রবাবু কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। বলা বাহুল্য শিশিরবাবুর নিকট এই খবর পৌঁছিতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হইল না। তিনি অনতিবিলম্বে বন্ধুবরের নিকট উপনীত হইয়া তদীয় চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু নিয়তির উপর কাহারো হাত আছে কি? যদি থাকিতো তবে সকলি অমর হইত, যমরাজার পুরী ছারখারে যাইত। কিন্তু তাতো আর হইবার নয়, তাই রামবাবুর আরোগ্যের জন্য শত চেষ্টা, শত শুশ্রূষা, শত অর্থব্যয় সকলি ব্যর্থ হইল। ঔষধে প্রতীকার হওয়া দূরে থাক্, পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিকারাবস্থায় রামচন্দ্রবাবু আবল তাবল কত কিছু বকিতে লাগিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলো যেমন অকস্মাৎ অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করে, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলে পশ্চিমাকাশ যেমন প্রগাঢ় অরুণজালে দীপ্তিমান হয়, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রামবাবুর শরীরেও তেমনি অবস্থা দৃষ্ট হইল। বিকারাবস্থা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া নিমেষ মধ্যে যেন নীরোগিতা ফিরিয়া আসিল। তাপমান-যন্ত্রে স্বাভাবিক তাপ নির্ণীত হইল, নাড়ী ও বক্ষঃ পরীক্ষায়ও কোনরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হইল না। সকলেই ভাবিলেন আর কোন ভয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায়

রামবাবু এবার শমনের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইলেন ভাবিয়া সকলেই যেন আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু হায়! ঈদৃশভাব আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। জলের উপর রেখাপাত করিলে যেমন তখনি মিলাইয়া যায়, বিজলীছটা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য সকলকে চমকিত করিয়া তখনি অন্তর্হিত হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে রামবাবুর শরীরেও তেমনি অবস্থা দৃষ্ট হইল। রামবাবু রক্ষা পাইলেন ভাবিয়া সকলেই মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কত আশা, কত ভরসা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, হায়! সকলি বৃথা হইল। সারাদিন পরিশ্রমের পর অরুণদেব যেমন পশ্চিমাকাশ অরুণছটায় উদ্ভাসিত করিয়া অচিরে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়েন, রামবাবুও সেইরূপ ক্ষণেকের জন্য সকলের হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া অকস্মাৎ চিরকালের জন্য ইহসংসারের এতকালের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। কে জানে, কোথায় গেলেন। ধন, জন, কোন কিছুই সঙ্গে গেল না।

জীব সংসারে একাকী আসে, একাকীই যায়। নিয়তির এই নির্ব্বন্ধ বা বিধান কাহারো লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। অবোধেরাই জীবের আবির্ভাবে আনন্দ এবং তিরোভাবে গগনভেদী আর্ত্তনাদে দিগন্ত নিনাদিত করে। আমরা অবোধ, তাই হাসি, আমরা মুর্খ, তাই আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন একটীবারও মনে করি না যে আমাদের বা আমাদের পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের

মৃত্যু বা অবস্থান্তর ঘটিবে, আমরা ভাবি চিরকালই জীবিত থাকিব, চিরকালই সুখভোগ করিব। মৃত্যু, অবস্থান্তর বা দুখঃভোগ শুধু অপরের জন্য বিহিত বলিয়া মনে করি; তাই অকস্মাৎ কোন বিপৎপাত হইলে নিতান্ত অধীর হই এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। ধন্য সাধুগণ! ধন্য পণ্ডিতগণ! ইঁহারা দুঃখে বা আকস্মিক বিপৎপাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত বা উদ্বিগ্ন হয়েন না, পক্ষান্তরে কোনরূপ ভোগসুখেও আসক্ত নহেন। অবোধ শ্যামাকান্ত! অবোধ নিশিকান্ত! অবোধ শান্তি! তোমরা কাঁদিতেছ কাঁদ, যতদূর পার গগনভেদী আর্ত্তনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত কর। ভূমে গড়াগড়ি আদি যত পার কর, কিন্তু জানিও মৃতব্যক্তি কখনো পুনর্জীবিত হইয়া আর ইহধামে ফিরিয়া আসিবে না। মরিবার জন্যই জীব জন্মগ্রহণ করে অথবা জন্মিলেই মরে ইহাই ঈশ্বরের বিধান। ইহা সর্ব্বদাই দেখ, তবে এত কান্না, এত অস্থিরতা কেন? আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে সকলেই কাঁদে, সকলেই অধীর হয়, পরের জন্য তো এরূপ কখনো করে না ইহাই আশ্চর্য্য! যেদিন পরের মৃত্যুতে কাঁদিতে পারিবে, পরের দুঃখে দুঃখিত হইবে, পরের বিপৎপাতে নিজকে বিপন্ন মনে করিবে সেই দিন তোমাদের কান্না, সেই দিন তোমাদের জীবন সার্থক হইবে মনে করিও; অথবা যেদিন পরকে আপন করিতে পারিবে, পরের সুখে আপন সুখ মনে করিতে পারিবে, সেই দিন তোমাদের জীবন সার্থক হইবে মনে করিও, অন্যথা নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বসু মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাকান্ত, কনিষ্ঠ নিশিকান্ত ও জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ শান্তিবালা এবং সহধর্ম্মিণী নিত্যসুন্দরীকে ইহলোকে রাখিয়া কয়েক বৎসর হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে স্বামী-বিয়োগজনিত মনোকষ্টে পতিগতপ্রাণা নিত্য-সুন্দরীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ক্রমে তিনিও শয্যাশায়িনী এবং দেখিতে দেখিতে পতিপথবর্ত্তিনী হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাকান্ত পিতৃ-মাতৃ-শোকে অধীর হইয়া পড়িল। আত্মীয়স্বজনের নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও অধিক দিন তাহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রহিল না, ফলে দুই বৎসরের মধ্যেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পিতামাতার অনুগমন করিল। কনিষ্ঠ নিশিকান্ত ভিন্ন, শ্বশুরগৃহে শান্তিবালার আপনার বলিবার আর কেহ রহিল না। পতিহীনা, কোমলপ্রাণা শান্তির হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শান্তির দেবর নিশিকান্ত আকস্মিক পিতৃ-মাতৃ-শোকে দুর্ব্বহ-শোকভার-দূরীকরণ-মানসে সুরাদেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, অচিরেই সুরাদেবী তাহার উপর বিশেষ প্রসন্না হইলেন, ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার কয়েকজন বিশিষ্ট ইয়ার জুটিল। সুরাদেবীর প্রসাদে বেশ আমোদপ্রমোদে নিশিকান্তের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিরূপে দিন যায়, রাত আসে, রাত যায় দিন আসে নিশিকান্ত বুঝিতেও পারিল না।

সুরাদেবীর প্রসাদে কখনো বা নর্দ্দমার কোমল শয্যায় (?) কখনো বা খালের ধারে পড়িয়া থাকিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার সময়াতিবাহিত হইতে লাগিল। আহা কি সুখ! কি শান্তি! সুরাদেবীর প্রিয় শিষ্য কুকুরগণ সুরাদেবীর প্রসাদ-লাভ করিবার মানসে কখনো বা তাহার গণ্ডদেশ লেহন করে, কখনো বা তাহার সহিত একত্র শয়ন করিয়া থাকে, এরূপভাবে মহাসুখে তাহার কাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। সংসারের দিকে, বাল-বিধবা শান্তির দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য শুধু আমোদ-প্রমোদের দিকে। নিশিকান্ত গাহিলেন—

সুরা ধর্ম্ম, সুরা স্বর্গ, সুরাই পরম জ্ঞান,
সুরার প্রসাদে লোক হয় দিব্য চক্ষুষ্মান্।
সুরার প্রসাদে লোক সুরপুরে যায়
ইন্দ্রাদি দেবতাসনে একত্র খেলায়।

সুরাদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিশিকান্ত এই গান গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া পড়ে, কোথায় পড়ে, কিভাবে থাকে তাহাতো পাঠক পাঠিকার অগোচর নহে। কিন্তু সুরাদেবীর প্রসাদ লাভ করিতে হইলে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়েরও দরকার। বিনাপয়সায়তো আর সুরা মিলে না। সুরাদেবীর কৃপায় নিশিকান্তের পিতা ও ভ্রাতার যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল তাহা নিঃশেষিত হইতে আর বড় বেশী দিন লাগিল না। ইয়ারগণও তাহার ঈদৃশী দশা দেখিয়া সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভাল মানুষ হইল, কিন্তু হায়! নিশিকান্তের

কুস্বভাব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। নিশিকান্ত নিরুপায় হইয়া বৌদিদি শান্তিবালার একমাত্র সম্বল বালা ও অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কার আত্মসাৎ করিল। পতিহীনা, নিরাশ্রয়া শান্তির যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল তৎসমস্তই দেবরের সুরার্চ্চনায় ব্যয়িত হইল। যার পতি নাই, সংসারে তার কিছুই নাই, তুচ্ছ অলঙ্কারে তাহার আসক্তি থাকিবে কেন? যিনি তার পতির পতি জগতের পতি, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইঙ্গিতে সংসাধিত হয় এবং যিনি অগতির গতি, শান্তি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিল। দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তায়ই তাহার সময়াতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহার পিতা শিশিরবাবু তাহাকে আনিবার জন্য কয়েকবার রাজমোহনপুর গিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তি প্রত্যেকবারই পিত্রালয়গমনে অস্বীকৃতা হইয়া পিতাকে বিদায় দিয়াছিল। প্রত্যেকবার প্রকাশ্যে বলিয়া-ছিল "বাবা! আমি এমন পোড়ামুখ কেমন করিয়া লোককে দেখাইব, আমি এই পবিত্র স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইব না"।

অতঃপর পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে, শিশিরবাবু তাহার কন্যার কোন খোজখবর রাখেন না, তাই তাহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, বামনয়ন ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইহা কোন এক ঘোর বিপদের পূর্ব্ব সূচনা মনে করিয়া শিশিরবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যেন তাহার কন্যা শান্তি তাহাকে বলিতেছে "বাবা! আমার দেবর আমার অলঙ্কার এবং

বাড়ীঘর সমস্ত বিক্রয় করিয়া আজ দশ দিন যাবৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে ; কত লোকের মারফত তোমার কাছে সংবাদ পাঠাইয়াছি কিন্তু তোমার কোন সংবাদ পাই নাই। কাল সারাদিনের মধ্যে যদি তোমার কোন সংবাদ না পাই তবে নিশ্চয় জানিও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অভাগিনী শান্তির জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইবে"।

এই স্বপ্ন দেখিয়া শিশিরবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডেই পাল্কি-বেহারা ঠিক করিয়া কন্যাকে স্বীয় বাস-ভবনে আনয়ন করিবার জন্য রাজমোহন-পুরাভিমুখে ছুটিলেন। স্বগ্রাম গঙ্গারামপুর হইতে শান্তির শ্বশুরালয় রাজমোহনপুর পাঁচ মাইল মাত্র ব্যবধান, মাঝখানে আশাবতী নদী। এই নদীতে একটীমাত্র খেঁয়া নৌকা, কাজেই পারাপারে বিশেষ অসুবিধা। এপারে নৌকা আসিলে ওপারের লোকদিগকে অধিকক্ষণ খেঁয়া-ঘাটে অপেক্ষা করিতে হয়, আবার ওপারে নৌকা পৌঁছিলে এপারের লোকদিগের তেমনি দুরবস্থা।

আজ ভাদ্রমাস, অমাবস্যা তিথি। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ায় পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। বেহারাগণ শিশিরবাবুকে নিয়া পাল্কি সহ পিচ্ছিল রাস্তাদিয়া অতিকষ্টে চলিতে লাগিল, পথ আর ফুরায় না। একে পথের দুর্দ্দশা, তার মধ্যে আবার শিশিরবাবুর ঘন ঘন তাড়া পাইয়া বেহারাগণ প্রমাদ গণিল। যাহা হউক পাল্কি কোনওক্রমে খেঁয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু খেঁয়া নৌকা তখন পর পারে ছিল বলিয়া শিশিরবাবুকে পাল্কি ও বেহারাগণ সহ অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করিতে হইল। সেখানে ক্রমে অনেক লোক জড় হইল, তন্মধ্যে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি শিশির বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আপনার বাড়ী কোথায়?

শিশিরবাবু—বাড়ী গঙ্গারামপুর।

প্রশ্নকর্ত্তা—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

শিশিরবাবু—রাজমোহনপুর।

প্রশ্নকর্ত্তা—আপনাকে এত ম্লান দেখা যাচ্ছে কেন? ব্যাপারখানা কি বলিতে কোন আপত্তি আছে কি? আপনার আত্মীয়ের মধ্যে কাহারো কোন গুরুতর অসুখ হইয়াছে কি?

উত্তরে শিশিরবাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শান্তি আছে কি নাই এই দুইটী বিপরীত ভাবনার তরঙ্গাঘাতে শিশিরবাবুর হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, এমন সময় কতিপয় ব্যক্তি বলাবলি করিতে লাগিল "গত রাত্রে রাজমোহনপুর হইতে একটী মেয়ে ওপারে আসিয়া অবধি যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার আর চেতনার সঞ্চার হয় নাই। আহা! কি সুন্দরী মেয়েটী! এমন অপরূপ রূপতো আর কখনো দেখি নাই! দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে! শিশিরবাবু এসব কথা শুনিয়া আরও বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কত লোক কত আশ্বাসের কথা বলিল কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। ইতিমধ্যে খেঁয়ানৌকা এপারে আসিল, বেহারাগণ পাল্কি সহ শিশিরবাবুকে নৌকায়

উঠাইল এবং দেখিতে দেখিতে খেঁয়া নৌকা ওপারে পৌঁছিল। পারে নামিতেই শিশিরবাবুর মাথায় যেন শত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি শান্তি, শান্তি বলিয়া ভূমিতে ধরাস করিয়া পড়িয়া গেলেন। যাহাহউক বহু লোকের শুশ্রূষায় তিনি অচিরেই চৈতন্যলাভ করিলেন, এবং শান্তিকে সম্মুখে দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। শান্তির তখনো ভালরূপ চৈতন্য-সঞ্চার হয় নাই। শান্তি, শান্তি বলিয়া শিশিরবাবু শান্তিকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া অমনি পাল্কিতে উঠিলেন এবং খেঁয়া পার হইয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতেই গঙ্গারামপুর নিজ বাটীতে উপনীত হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশ একজন সুযোগ্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিল ; ভগবৎ-কৃপায় সপ্তাহকাল মধ্যেই শান্তি নিরাময় হইল, কিন্তু এই আকস্মিক ব্যাপারে বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়ের অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ক্রমে তাহার দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল অবশেষে ৭৫ বৎসর বয়সে একদিন হঠাৎ ইহধামের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। শান্তির মনে আর এক অশান্তি স্থান লাভ করিল। শিশিরবাবু জীবদ্দশায় নিজবাটীতে বড় একখানা কাপড়ের দোকান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদির পর রমেশ ও দীনেশ তাহার উন্নতিসাধনকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শিশিরবাবু নিজবাটীতে বড় একখানা কাপড়ের দোকান সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। কাপড় ক্রয়োপলক্ষে প্রত্যহ কত লোক তাহার দোকানে আসিতে লাগিল। এতদুপলক্ষে পরগণার জমিদারের নূতন নায়েব শোভাসকুসুম মিত্র একদিন তাহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভাসকুসুম যুবক নিতান্ত খারাপ চরিত্রের লোক। সে দৈবক্রমে শান্তির স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-বিকশিত নবযৌবন সন্দর্শন করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইল। তাহার ফলে সে ঘন ঘন শিশিরবাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিল, উপলক্ষ কেবল কাপড় কেনা কিন্তু ভিতরে ভিতরে কত জল্পনা কল্পনা, পৈশাচিক প্রেমের তাড়না।

সুযোগ বুঝিয়া এক দিন শোভাসকুসুম শান্তির নিকট তাহার ঘৃণ্য প্রস্তাবের অবতারণা করিল কিন্তু তদুত্তরেসতী শান্তি যাহা বলিল তাহাতে শোভাসকুসুম মর্ম্মাহত হইল, কিন্তু লম্পট শোভাসকুসুম ফিরিবার পাত্র নয়। সে যে প্রকারেই হউক শান্তিকে হস্তগত করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইল, সুযোগও বেশ ঘটিয়া উঠিল। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শান্তি পুকুরে জল আনিতে গিয়াছে, বরাবর যেমন যায় তেমনি গিয়াছে, মনে কোনরূপ আশঙ্কার অনুমাত্র কল্পনাও নাই এরূপভাবেই গিয়াছে কিন্তু ফিরিবার কালে শুক্‌নো ডালে ঘন ঘন কা-কা-কা রব শুনিয়া

অবশ্যম্ভাবী কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল। যেমনি দাঁড়াইল অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে অকস্মাৎ শোভাসকুসুম আসিয়া শান্তির মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া দিয়া বাক্‌রোধ করিল এবং অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে জোর করিয়া তাহার বাসায় নিয়া গেল। অভাগিনী একটী কথাও বলিতে পারিলনা এবং কেহ জানিতেও পারিল না শান্তি কোথায় গেল।

যথাসময়ে শান্তিকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া রমেশের স্ত্রী অনুপমা ও দীনেশের স্ত্রী মহামায়া প্রমাদ গণিল। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে এই দুঃসংবাদ নিজ নিজ স্বামীর গোচর করিতে ক্রুটী করিল না। রমেশ ও দীনেশ সারারাত কত অনুসন্ধান করিল, কত স্থান, কত রাস্তা, কত বন, কত উপবন খুঁজিল কিন্তু হায়! কোথাও শান্তিকে পাওয়া গেল না, তখন তাহারা মনে করিল হয় কোন দুর্বৃত্ত তাহাকে হরণ করিয়া কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া থাকিবে, না হয় পুকুরে জল আনিতে গিয়া জলমগ্ন হইয়া থাকিবে। কোনও স্থানে শান্তিকে না পাইয়া তাহারা বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তন্ন তন্ন করিয়া পুকুরের জলে তাহার অনুসন্ধান করিল কিন্তু সেখানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। সারারাত বিফল পরিশ্রম করিয়া রমেশ ও দীনেশ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি পরদিন প্রাতে নিজ নিজ স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে, অনিচ্ছায় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া পুনরায় শান্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, দুপুর অতিক্রান্ত হইয়া

গেল, সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন কিন্তু রমেশ ও দীনেশের সেই দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, তাহারা অবিরাম অনুসন্ধান করিতে লাগিল আর ভক্তিভরে, কাতরপ্রাণে ভগবানকে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল।

পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই জানেন যে, যাহারা একমনে ভগবানকে ডাকে ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, কারণ কথিত আছে ঃ—

যাঁহারা কাতরস্বরে, অবিরাম নাম করে
জগদীশ তাঁহাদের বাসনা পূরায় ;
প্রহ্লাদ ও ধ্রুব তার, আছে সাক্ষী কত আর,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা বিদিত ধরায়।

আমরা নাস্তিক, আমরা ভুলিয়াও একবার তাঁহাকে স্মরণ করি না, তাঁকে ডাকি না, মনে করি সকলই আপনাআপনি হয়, আপনাআপনি যায়, ঈশ্বর টীশ্বর আবার কে ! যখন যা মুখে আসে বলি, যখন যা ইচ্ছা হয় করি। আমরা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছি, ইংরেজি শিখিয়াছি, তাই ইংরেজিতে হাসি, ইংরেজিতে কাঁদি এমন কি ইংরেজিতেও স্বপ্ন দেখি। হ্যাট পরি, কোট পরি, চোখে চসমা দিয়া বক্রভাবে এ ওর পানে নিরীক্ষণ করি, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি ইত্যাদি, ইত্যাদি কত কিছু করি। আহা! ইহার সঙ্গে সুরাদেবীর প্রসাদের সংস্রব থাকিলে কত সুখ, কত আনন্দ মনে

করি। ইংরেজি ইতিহাস পড়িয়া ইংরেজের চৌদ্দ পুরুষের নাম একদমে বলিতে পারি কিন্তু নিজবংশাবলীর চার পুরুষের নাম কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই আক্কেল গুড়ুম্। পিতৃ পুরুষদের আচার-ব্যবহার, হিংসা-বিহীনতা, সরলতা ইত্যাদি মনে করিয়া তাহাদিগকে "ফুল" বা নির্ব্বোধ নামে অভিহিত করিতেও ক্রুটী করি না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা, তাই আমাদের এত দুঃখ। আমরা ইংরেজি শিখিয়া প্রায় পূর্ণমাত্রায় ইংরেজিভাবাপন্ন। কাটা, চামচ না হইলে ভোজন করিতে পারি না, কাষ্ঠাসনে বা কুশাসনে বসিয়া ভোজন করিতে লজ্জাবোধ হয়, কিন্তু ইংরেজদের অধ্যবসায়, অনালস্য, সময়ের সদ্ব্যবহার, সময়ে আহার-বিহার ও অপরাপর সুনিয়মগুলি ভুলিয়াও অনুকরণ করি না। তাঁহাদের শীতপ্রধান দেশে যেরূপ-ভাবে চলিলে, যাহা যাহা আহার করিলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে সেইরূপভাবেই তাঁহারা চলেন, সেইরূপ খাদ্যই তাঁহারা আহার করেন, সেইরূপভাবেই বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আবৃত রাখেন। আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী, শীতপ্রধান দেশোপযোগী ও সকল অনুকরণ করিলে আমাদের চলিবে কেন? চলতো না-ই বরং খাল কেটে কুমীর আনার মত আমাদের দশাটা হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের শরীর নানা দুঃসাধ্য রোগের আবাস-স্থল হইয়া পড়ে, ফলে অসময়ে জীবন লীলা সম্বরণ করিতে হয়। ইংরেজেরা স্বাস্থ্যবিধি সংরক্ষণ করিয়া চলে বলিয়া সবল, নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ, আর হতভাগ্য আমরা রুগ্ন, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ুঃ।

পাঠকপাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। এক বিষয় বলিতে গিয়া অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি বলিয়া আপনাদের হয়তো ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকিবে। আপনারা নাজানি এজন্য আমার উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন কিন্তু অনেক সময় কর্ত্তব্যানুরোধে এইরূপ ও অপরাপর অনেক কথার অবতারণা না করিলে চলে না তাই করিলাম।

পাঠকপাঠিকার হয়তো স্মরণ থাকিতে পারে যে যাঁহারা একমনে ভগবানের নাম করেন, ভগবানকে ডাকেন ভগবান তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন এই কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ একথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ইহার বহুল প্রমাণ আছে তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই রমেশ ও দীনেশ পূর্ণ উদ্যমে, দ্বিগুণ উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে শাস্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে এই শাস্তি-হরণ ব্যাপার গ্রামের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। এই ব্যাপার সকল স্থানে সকলের নিকট রাষ্ট্র হইলে সকলের চিত্তই ক্রোধে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইল। কিরূপে দুর্বৃত্তকে বাহির করিয়া আদর্শ শাস্তি প্রদান করিবে ইহা যেন সকলেরই চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। পরদুঃখকাতর ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ হইবার কথা। যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহাদেয় হৃদয়ে মনুষ্যত্বের কণামাত্রও বিরাজমান তাঁহারা কি কখনো এইরূপ ব্যাপারে উদাসীন

থাকিতে পারেন ? গ্রামবাসী ও সদলবলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সমবেত চেষ্টা ও অনুসন্ধান-ফলে অবশেষে ভগবান সুপ্রসন্ন হইলেন। যখন শোভাসকুসুম শান্তির মুখ-বিবর বস্ত্রদ্বারা রুদ্ধ করিয়া তাহাকে হরণ করিয়া নিয়া যায়, তখন শান্তি কোনরূপ বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও হস্তপদাদিদ্বারা দুর্বৃত্তের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। দুর্বৃত্ত ইহাতেও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাহাকে তাহার কাছারী বাড়ীতে নিয়া যায়, কিন্তু তথায় তাহার মুহুরীগণ তাহার এই জঘন্য কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করে এমন কি রাজপুরুষদের কর্ণগোচর করিতেও ত্রুটী করে নাই। অদূরে গ্রামবাসীদের কলরব এবং রাজপুরুষদের ভীষণ কোলাহল শোভাসের মনে বিশেষ আতঙ্কের সঞ্চার করে ; তাই সে উপায়ান্তর না দেখিয়া, কাছারী বাড়ীর অদূরে সদর রাস্তার ধারে তাহাকে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে কোথাও পলায়ন করে। গ্রামবাসীগণ ও রাজপুরুষেরা শীঘ্রই শান্তিকে ঐস্থানে তদবস্থায় দেখিতে পায়। খুঁজিতে খুঁজিতে রমেশ এবং দীনেশ ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বহুলোক পরিবেষ্টিত শান্তিকে দেখিতে পাইয়া হা দিদি ! হা দিদি বলিয়া শান্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া উভয়েই মূর্চ্ছা গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও সমবেত জনবৃন্দ এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া অবাক ও স্তম্ভিত হইলেন। এতো গেল রমেশ ও দীনেশের কথা। শান্তির তৎকালীন অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণের হৃদয় ও দ্রবীভূত হয়।

আলুলায়িত-কেশা, সাশ্রুনয়না, ব্রীড়াবনতা শান্তি ধূলিধূসরিত শরীরে, অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে এবং মাঝে মাঝে "হা ঈশ্বর" ! "হা করুণাময়", "আমার কপালে কি এই ছিল" বলিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। এ দৃশ্য দর্শন করিলে কোন পাষাণের হৃদয় না বিদীর্ণ হয় ?

যাহাহউক অতঃপর রমেশ ও দীনেশের মূর্চ্ছা অপনীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—টোমার নাম কি ? এ টোমার কি আছে ?

রমেশ—আমার নাম রমেশ। ইনি আমার ভগিনী।

ম্যাজিষ্ট্রেট দীনেশকেও তদনুরূপ প্রশ্ন করিলেন, দীনেশ ও প্রণত হইয়া উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিল।

সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অতঃপর সর্ব্বসমক্ষে শান্তির এজাহার লইয়া, ভবিষ্যতে শান্তির উপর আর কোন অত্যাচার না হয় এজন্য রমেশ ও দীনেশের বাড়ীতে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া রমেশ, দীনেশ ও শান্তি এ তিন জনকেই বিদায় দিলেন এবং শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার করিয়া যথোপযুক্ত বিচার করিবেন বলিয়া জন-মণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়া সদলবলে সদরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আজ প্রায় পঞ্চদশ দিন অতীত হইতে চলিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদরে চলিয়া গিয়াছেন। বড় দিন উপলক্ষে কাছারী বন্ধ থাকায়, শান্তি শোভাস-ঘটিত মোকর্দ্দমার এযাবৎ কিছুই হয় নাই। যাঁহারা আসামীকে ধরাইয়া দিবেন—বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লম্বা-চওড়া কথায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারো মুখে এখন "টু" শব্দটি পর্য্যন্ত নাই—যেন কিছুই হয় নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের স্বভাবইতো এই। সত্য বুঝি না, মিথ্যা বুঝি না, যে পক্ষ প্রবল সেই পক্ষ অবলম্বন করাই আমাদের মত ভীরুলোকের রীতি; শুধু আমাদের কেন, বোধ হয় অনেকেরই এই স্বভাব।

শোভাস মিত্তির বড় জমীদারের নায়েব, কার সাধ্য তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে। পাছে বাস্তুভিটা হইতে উৎসন্ন হইতে হয় এই ভয়েই যেন সকলে অস্থির। শোভাস কয়েক দিন মাত্র গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল যে সকলেই তাহার পক্ষে, তখন সে অবাধে চলাফেরা এবং পূর্ব্ববৎ কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। ভয়ে কেহই তাহার বিপক্ষাচরণ করিতে সাহসী হইল না, কিন্তু গ্রামের বৃদ্ধ হরিঘোষ যার "তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে" তিনিই কেবল শান্তিবালার পক্ষে সহানুভূতি ব্যঞ্জক দু-চারটী কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বুড়ো বয়সে "গৃহশূন্য" হওয়ায় তিনি মরমে দুর্ব্বিসহ যাতনা-ভোগ করিতেছিলেন। সময় মত খেতে পান না, যখন যাহা চান তাহা তৎক্ষণাৎ কেহই তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেনা তিনি এইরূপ ও অপরাপর অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়া যে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন তাহা তাহার মত ভুক্ত ভোগী ব্যতীত অন্য হে অনুভব করিতে কিম্বা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। দিনটাতো কোনও মতে একাজে ও কাজে, একথায় ওকথায় চলিয়া যায় কিন্তু—রাত্রি আসে, না শমন আসে, তার কাছে এরূপই মনে হইত। রাত্রিতে আহারের পর বিছানায় শয়ন করিয়া তাহার কোনরূপ সোয়াস্তি নাই, সকলি আছে অথচ কি যেন নাই এইরূপ একটা কেমন কেমন ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিশেষরূপে বিরাজ-মান ছিল। অত্যানন্দে বা অতি দুঃখে অনেক সময় আপনা আপনি গান বেড়োয় ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। এ বৃদ্ধের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি সারারাত গান গাহিয়া গাহিয়াই কোনরূপে কাটাইয়া থাকেন, গানের দুই একটী নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

কাফিসিন্ধু—কাওয়ালি।

"চরণে দেগো ঠাঁই দীনে (ও মা)
ধরম-করম-হারা লক্ষীছাড়া আমি তারা,
নাই মা আমার বিল্বদল, মন্ত্র-তন্ত্র গঙ্গাজল,
অন্য কিছু নাই মা আমার চক্ষের জল বিনে।

অহঙ্কারে পোরা, মায়ায় ঘেরা চারি ধার,
মোহে মনে লাগায় ধাঁধাঁ, হেরি সবই অন্ধকার,
খু'লে দে এ বিষম ধাঁধাঁ, ঘুচিয়ে দেমা চোখের ধাঁধাঁ,
পথহারা হ'য়ে ঘুরি, কোথায় পথ দেমা বলি,
আর শ্যামা বলিস্‌নে মা ম'রেপড়ি নইলে।"

হাম্বির—যৎ।

এত ক'রে ডাকি শ্যামা শু'নেও তা শুনিস্‌না,
দিবানিশি কাঁদি আমি, দেখেও তা দেখিস্ না।
লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে তারা ভাবিয়া হতেছি সারা,
কিসে পাব পরিত্রাণ ব'লে দেমা ত্রিনয়না।
মায়া-মোহ আদি ক'রে সকলি রয়েছে শিরে,
এ সকল ছিন্ন ক'রে দীনে করো মা করুণা।

ভাব-সাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া এইরূপ কত গান গাহিয়া যে তিনি রাত্রি-যাপন করিতেন তার আর অবধি ছিলনা। গ্রামের ছেলে মেয়েরা তাহাকে দেখিলেই কেহ বলিত "হ'রে পাগলা," কেহ বলিত "পাগলা ঘোষ," কেহবা "মাগ্‌খেকো বুড়ো," কেহ বা "বিয়ে পাগলা বুড়ো" ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিত কিন্তু বুড়োর সে দিকে দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি শুধু "শান্তিবালার" দিকে শান্তিবালার কুৎসা, শান্তিবালার অন্যায় অপবাদ তাহার প্রাণে সহ্য হইতনা, শুনিলেই বুড়োর রাগ হইত, কিন্তু হইলে কি হবে, গ্রাম

শুদ্ধ লোক যার বিপক্ষে, একা হরি ঘোষ তাহার পক্ষে থাকিয়া কি করিবে ? বুড়ো তবু নাছোড়বান্দা, তিনি প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোভাস কুসুমকে যেন তেন প্রকারেণ "একটু না একটু জব্দ করিবেনই"। তাঁহার ভরসা—ন্যায়ের পক্ষপাতী সদাশয় গভর্ণমেণ্ট,—ন্যায়বান পরমেশ্বরের অসীম করুণা ;—অসীম করুণাময় জগদীশ্বর ও তৎপ্রতিনিধি সদাশয় গভর্ণমেণ্ট থাকিতে এ বিষয়ের ন্যায় বিচার ও আসামীর কঠোর দণ্ড না হইয়াই পারেনা কিন্তু দশচক্রে ভগবান পর্য্যন্ত ভূত বলিয়া সাব্যস্ত হয় এরূপ ধারণা ঘোষ মহাশয়ের—কোমল মস্তিষ্কে এ যাবৎ প্রবেশাধিকার-লাভ করিতে পারে নাই। যথা সময়ে—ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা আসামী শোভাস কুসুমের হস্তগত হইল, শোভাস কোনরূপ আপত্তি না করিয়াই কাছারীতে-হাজির হইল। ফরিয়াদি পক্ষ ও অপর পরওয়ানা পাইয়া কাছারীতে-উপস্থিত হইল।

একমাত্র সাক্ষী ঘোষ মহাশয় ও সাক্ষ্য দিবার অভিপ্রায়ে কাছারীতে হাজিরা দিলেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে "দশচক্রে ভগবান ভূত" সেই ক্ষেত্রে বিচারে যাহা হয় তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শান্তিবালার পক্ষে থাকিলেও বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন। এত-দিনে সব শেষ হইল, কলির কলি এতদিনে ফুটিয়া উঠিল। সাক্ষী ঘোষ মহাশয় বিচার-ফল দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যাঁহারা প্রথমে শোভাসকে কঠোর দণ্ডে

দণ্ডিত করাইবেন বলিয়া—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাঁহারাই এখন শোভাসের পক্ষালম্বন করিয়া এইরূপ বিচার-বিভ্রাট জন্মাইলেন। যেখানে বহু আড়ম্বর সেখানে লঘু ক্রিয়াই হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। রমেশ ও দীনেশ ক্ষুণ্ণ মনে শান্তিকে নিয়া বাড়ী ফিরিল, অপর পক্ষ রণবিজয়ীর মত সোৎসাহে ও হর্ষোৎফুল্ল নয়নে হৈ হৈ রৈ রৈ রবে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া স্কুল ছুটী হইলে ছেলেরা যেরূপ করে কতকটা সেইরূপ ভাবেই যেন কাছারী-প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া—যার যার নিজ নিজ ভবনাভিমুখে ধাবিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

বিচার ফল টেলিগ্রাফের খবরের মত সকলেরই কর্ণ-গোচর হইল, কোণার কুলবধূ পর্য্যন্ত বাকী রহিল না। পাঠক-পাঠিকাগণ ও কিরূপ বিচার হইল দেখিলেন। এরূপ বিচার হওয়া যে অস্বাভাবিক তা নয়। আজ কাল সমাজের যে অবস্থা তাহাতে এরূপ বিচার বিভ্রাট সচরাচরই হইয়া থাকে। যতদিন না সমাজের সংস্কার হইবে, যতদিন না আমরা সত্য ও ন্যায়পরায়ণ হইব ততদিন এরূপ বিচার অবশ্যম্ভাবী ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের দোষ কি? দোষ সমাজের, দোষ আমাদের।

শান্তি-শোভাস ঘটিত মামলার বিচার ফল শ্রুত হইবা মাত্র গ্রামের বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত ন্যায় বাচস্পতি মহাশয় আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, এবং সুদীর্ঘ শুভ্র টিকি ঘন ঘন সাঞ্চালন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠি-লেন "দেখ্‌বো এবার ব্যাটারা যায় কোথায়, কে ওদের বাটীতে বার মাসে বারক্রিয়া করে একবার দেখে নেবো এখন। ব্যাটারা ওদের বাপের শ্রাদ্ধে আমাকে একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করে নাই। নিজেরা বড় ঘরে বে কল্লে কিন্তু আমাকে একটা সিধে পত্তর পর্য্যন্ত দিলে না। আশাবতী নদীর তীরে খেয়াঘাটে ওদের ভগিনী শান্তি কেন অচেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল তাহা বুঝি আর আমরা কিছুই জানিনা! ওদের বাপ শিশির ঘোষের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তবু সে গলবস্ত্র হইয়া

আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করায় শান্তিকে গৃহে স্থান দিতে আমিই পাতি দিয়াছিলাম। আমার ভয়ে গ্রামবাসী কেহই কোনরূপ আপত্তি বা বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই, তাই সেবার রক্ষা। এমন ভাল লোকের ঘরে এমন ছেলেপিলে ও জন্ম গ্রহণ করে যে পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে, একবার ও চেষ্টা করেনা, একবার ও ভাবেনা যে "হামবড়া" হইলে সকল স্থলে চলেনা, একবার ও ভাবেনা যে ধন-জন-যৌবন জীবন স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী।" তর্কসিদ্ধান্ত ন্যায় বাচস্পতি মহাশয় এইরূপ আস্ফালন করিতেছেন এমন সময় তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবী গৃহান্তর হইতে আসিয়া পতিসমীপ-বর্ত্তিনী হইলেন। পতিপ্রবরের তৎকালিন অবস্থা সন্দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন কোথাও কোন একটা বিশেষ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবে। সহধর্ম্মিণীকে সমীপবর্ত্তিনী হইতে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও টিকি সঞ্চালন পূর্ব্বক উগ্রমূর্ত্তিতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্ফালন করিতে লাগিলেন। স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া নিস্তারিণী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন ওগো! ব্যাপার খানা কি?

পণ্ডিত—ব্যাপারখানা কি আবার জিজ্ঞাসা করছো! তুমি কিছুই জাননা যেন আকাশ থেকে পড়ছো আর কি! কোণার কুলবধূ পর্য্যন্ত শান্তি-শোভা ঘটিত মোকর্দ্দমার ফলাফল জানিয়াছে আর তুমি জাননা, এতক্ষণ তুমি কি ঘুমিয়ে ছিলে?

নিস্তারিণী—আমি ঘুমিয়ে ছিলুমনা, তুমিই বরং ঘুমিয়েছিলে এবং এখনও ঘুমিয়েই আছ।

পণ্ডিত—বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কেমন" ?

নিস্তারিণী—সে কেমন আবার বলছো! আমি বিচার ফল তোমার অনেক পূর্ব্বেই শুনিয়াছি এবং কি করিতে হইবে তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।

পণ্ডিত—কি ব্যবস্থা করিলে ?

তুমি কি স্মৃতি-শাস্ত্র কখনো পাঠ করিয়াছ যে ব্যবস্থা করিতে শিখিয়াছ ?

নিস্তারিণী—স্মৃতি-শাস্ত্র পড়িনি, স্মৃতি-শাস্ত্র কাকে বলে তাও কখনো জানিনে, তবু এরূপ ব্যাপারে যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা বেশ জানি, তাই ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।

পণ্ডিত—কি ব্যবস্থা করিয়াছ ?

নিস্তারিণী—রমেশ ও দীনেশ তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে এমন কি তাহাদের নিজ নিজ বিবাহ উপলক্ষে ও তোমাকে নিমন্ত্রণ না করায় ও বিদায় না দেওয়ায় তোমার যে অপমান করা হইয়াছে তাহা কি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব ? এবার আমার ব্যবস্থার পূর্ব্বাপ-মানের বিশেষ প্রতিশোধ হইবে এবং ক্ষতি পূরণ ও যথেষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থাটী এই—

এ পাড়ায় ও পাড়ায়, এ বাড়ী ও বাড়ী অর্থাৎ গ্রামের সকল স্থানে ঢেড়া পিটিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে—"যে কেহ শিশির

ঘোষের বাড়ীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে বা যে কোন কারণে ভোজন করিবে, কিম্বা জল গ্রহণ করিবে তাহাকেই একঘ'রে হইতে হইবে। তাহাদের বাড়ীর পুকুরের জল গৃহে আনিলেও তদ্রূপ ফল।"

সহধর্ম্মিনীকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া—বাচস্পতি মহাশয় কৌতুক করিয়া বলিলেন—বটে! বটে! কে বলে তুমি স্মৃতিশাস্ত্র একবারও পাঠ করো নাই। তোমার এত ছোট মাথাটার মধ্যে এত বড় স্মৃতি-শাস্ত্র যে গজ্ গজ্ করিতেছে ইহাতো আমি ইতঃপূর্ব্বে ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারি নাই, জানিতে পারিলে এ বৃদ্ধ বয়সে আর এত মাথা খাটাইতে হইতো না। অদ্যাবধি তোমাকে "স্মৃতি-পঞ্চাননী" উপাধি দিয়া—শ্রাদ্ধাদি কার্য্যোপলক্ষে আমি না যেয়ে তোমাকেই পাঠাইব? তুমি যে বাস্তবিক আমার উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী তাহা এতদিনে বুঝিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম।

নিস্তারিণী—রেখে দাও তোমার ঠাট্টা; বিদ্রূপ! এসময় আর এসব ভাল লাগে না। যতদিন না আমাদের অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিব ততদিন আর আমার সোয়াস্তি নাই।

পণ্ডিত—তবে যাও দেখ, আর কিছু করিতে পার কি না। এই যাই বলিয়া নিস্তারিণী অতিদ্রুত পদবিক্ষেপে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কাকে মার্‌বেন্ কাকে কাট্‌বেন কতকটা এরূপ ভাব নিয়াই যেন বাটী হইতে বহির্গতা হইলেন। তাহার সঞ্চলন ভঙ্গী

দেখিয়া পাড়ার একটী ছোট ছেলে ভয় পেয়ে মাগো! মলেম্‌গো! গেলাম গো! বলিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে হুছোট খাইয়া—পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। সমবয়স্ক অন্যান্য ছেলে মেয়েরা নিস্তারিণী সন্দর্শনে অজ্ঞান না হইলেও পড়ি কি মরি এইভাবে ছুটিয়া পালাইল। নিস্তারিণীর কিন্তু এ দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। তাঁর লক্ষ্য শুধু রমেশ ও দীনেশকে জব্দ করা অন্য কিছু নয়। নিস্তারিণীর যেরূপ চেহারা তাহাতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেন অনেক পুরুষেরাও ভয়ে আতঙ্কিত হয়। অত বড় দীর্ঘ স্ত্রীলোক বোধ হয় কেহ কখনো দেখেন নাই, পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কখনো দেখিয়াছেন কি না তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য যেমন, বিস্তার ও যেন প্রায় তেমনি, দূর হইতে আপাততঃ এরূপই মনে হয়। তাঁহার বিশাল দেহকাণ্ড, প্রায় আকর্ণ বিস্তীর্ণ নাসিকা, প্রকাণ্ড নাসারন্ধ্র দ্বয়, কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তক, ক্ষুদ্র শ্রবণেন্দ্রিয়, কোটরাবিষ্ট ক্ষুদ্র চক্ষু, আকর্ণবিস্তৃত ভ্রূযুগল, পাদমূলপর্য্যন্ত লম্বমান কেশকলাপ ও স্থূল হস্তপদদ্বয় সন্দর্শন করিলে ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রায় সকলেরই মন আপ্লুত হইত, এমন কি তাঁহার স্বামী বাচস্পতি মহাশয়ও তাহাকে অনেক সময় ভয় করিয়াই চলিতেন কিন্তু তাহাকে একদণ্ড না দেখিলেও আবার অস্থির হইয়া উঠিতেন, তাঁহার সন্ধ্যাপূজা পর্য্যন্ত মাটি হইয়া যাইত, কেন এরূপ হইত তা তিনিই জানেন, তিনিই বলিতে পারেন। নিস্তারিণীর শরীরের বর্ণ সম্বন্ধে কেহ বলিতেন

তিনি কালো, কেহ বলিতেন তিনি না কালো, না শ্যামা, কেহ বা বোসেদের বাড়ীর গাঁব গাছের রংএর সহিত তাহার গায়ের রংএর তুলনা করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন, কিন্তু তার কাছে নয়, তার পরোক্ষে। তিনি কালোই হউন, শ্যামাই হউন অথবা অন্য যাহাই হউন তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না, আসে যায় শুধু বাচস্পতি মহাশয়ের। তাহাকে কালো বলিলে বাচস্পতি মহাশয়ের ক্রোধের সীমা থাকিত না। কাজেই বাচস্পতি মহাশয়ের ভয়ে তাঁহার কাছে তদীয় রূপসীর অপরূপ রূপের ব্যাখ্যা করিতে কেহই সাহসী হইত না। নিস্তারিণী যাহাই রন্ধন করিতেন, মন্দ হইলেও বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট তাহাই অমৃতের মত বোধ হইত, প্রকাশ্যে বলিতেন—"এমন রন্ধন আর কখনো খাই নাই"। সোহাগভরে কখনো বলিতেন—

"আমার প্রিয়ার সবই মিঠে, সবই মিঠে গো,
রান্না মিঠে, কথা মিঠে যেন পাটিসাপ্‌টা পিঠে গো, পাটি-
সাপ্‌টা পিঠে।
তার রং হউক মিশমিশে বা ফিট্‌ফিঠে।
মিষ্টি তার বচন-সুধা, মিষ্টি চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে।
তার চলন মিষ্টি, শুভদৃষ্টি, চোখ রাঙ্গানি আরো মিঠে,
মিষ্টি আরো কিল-চাপড় ভাগ্যে যবে পড়ে পিঠে"।

তাহার জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিলে বাচস্পতি মহাশয়ের কর্ণকুহর যেন সুশীতল হইয়া যইাত! অহো! কি দাম্পত্যপ্রেম!

কিন্তু—এত বড় ভালবাসার মধ্যেও মাঝে মাঝে আকস্মিক ঝটিকার ন্যায় প্রবল কলহের সূত্রপাত হইত। সেই কলহ কেবল সুগন্ধি সাবান; সুগন্ধি তৈল, এসেন্স ইত্যাদি নিয়া। এইচ্ বোসের কুন্তলীন। ডাক্তার পি বানার্জ্জির লক্ষ্মীনারায়ণ তৈল, বুল বুল ফ্যাক্টরীর সুগন্ধি সাবান—এইগুলি তার প্রিয় সামগ্রী। এসকলের কোনটীর অভাব হইলেই নিস্তারিণী স্বামীর নিকট আবদার করিয়া বসিতেন। নিস্তারিণী বয়সে বৃদ্ধা হইলেও এ সকলেরদিকে তার বড় একটা টান ছিল। এসব না হ'লে তার কিছুতেই চলিত না—যেমন এখনকার মেয়েদের চলে না। পাছে বা কেহ তাকে কালো বলে, পাছে বা কেহ তাকে নোংড়া বলে তার মনে এ আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিরাজমান ছিল। প্রকাশ্যে যদিও কেহই তাকে ওরূপভাবে সম্ভাষণ করিতে সাহসী নয় এ ধারণা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতেন তবু তার মনে কেন যে এ আশঙ্কার উদয় হইত তা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না! তিনি সাবান মেখে সর্ব্বদাই স্নান করিতেন এবং স্নানান্তে সুগন্ধি তৈল ও এসেন্স ব্যবহার করিয়া স্বামীদেবের নয়ন ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিতেন। অর্থাভাবপ্রযুক্ত বাচস্পতি মহাশয় কখনো নিস্তারিণীর সোহাগ সামগ্রী প্রদানে অস্বীকৃত হইলে তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন "আমি কি বুড়ো হ'য়েছি। আমার কি কোন একটী দাঁত পড়েছে—না কোন একটী চুল পেকেছে যে আমার এসব ব্যবহারের দিন গিয়েছে। যতদিন বাঁচিব এসব ব্যবহার করিবই করিব। দিতে না পারিলে

বিবাহ ক'রেছিলে কেন ? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা তখন"। আমি দু দশটা গহনা চাই না আর কোন মূল্যবান জিনিষ চাই যে তুমি দিতে পারিবে না ? এইসব নিয়ে উভয়ের মধ্যে বেশ একদফা কলহ হইয়া যাইত। যখন কলহ খুব উচ্চসীমায় উঠিত তখন বাচস্পতি মহাশয় উপায়ান্তর না দেখিয়া মাটিতে একটী দাগ কাটিয়া বলিতেন—"ওগো ! এখনো থামো, এখনো থামো। এই দেখ "ম" লিখিলাম, যদি বেশী একটু বাড়াবাড়ি কর তবে এখনি আকার দিব"। নিস্তারিণী জিভ কাটিয়া তখনই—গৃহমধ্যে প্রস্থান করিত এবং প্রকাশ্যে—বলিত যাক্ এখন না দিলেও চলিবে, দুচার দিন পরেই দিও, এত কষ্ট ক'রে আকার টাকার দিয়ে দরকার নাই। কলহ সহজে মিটাইবার পক্ষে এইটীই বাচস্পতি মহাশয়ের অব্যর্থ কৌশল ছিল। এই অপূর্ব্ব কৌশলটীর মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে কেহ পারিলেন কি ? যদি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে বাচস্পতি মহাশয়ের মত কোন লোকের নিকট এখনি গমন করুণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

নিস্তারিণী রমেশ ও দীনেশকে জব্দ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবে অঙ্গীকার করতঃ যে ভাবে বাটী হইতে নিস্ক্রান্তা হইয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বোধ হয় ইতিমধ্যে কেহই বিস্মৃত হন নাই।

প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে যেমন সম্মুখস্থ লতা পাতা ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও যেন

কতকটা তদ্রূপ এদিকে ওদিকে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিল। প্রতিকূল বাতাসে পাছে বা তাহার নাসিকাবিবরে প্রবিষ্ট হয় এই ভয়েই যেন শিশুগণ যে যেদিকে পারিল ধাবমান হইল। নিস্তারিণী কিন্তু সেই দিকে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া সোজা ঘোষেদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং গগণস্পর্শী শব্দে রমেশ, দীনেশ, শান্তি, এবং রমেশ ও দীনেশের সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের প্লীহা চমকিত করিয়া শাসাইয়া বলিলেন—দেখ্ রমেশ ! দেখ্ দীনেশ ভাগ্যি থাকে তো এখনো শান্তিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর্ নতুবা সমাজে আর তোদের স্থান নাই। ধোপা, নাপিত, ইত্যাদিতো ইতিমধ্যেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি, ইহাতেও যদি—পথে না আসিস্ তবে তোদের আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিব। হাটে, বাজারে কোথাও কোন জিনিষ পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারিবি না। আমি তোদের ভালোর জন্যই বলিতেছি এখনও পথে আয়। পাঁচশত টাকা নিয়ে এখনি বুড়োর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চা, বুড়োর কাছ থেকে পাতি এনে প্রায়শ্চিত্ত কর্, তবেই রক্ষা, নতুবা আজও গেলি, কালও গেলি। শোভাষবাবুর নামে মিছামিছি নালিস ক'রেছিলি, ফল কি হয়েছে দেখ্‌ছিস্ তো। সাক্ষী প্রমাণাভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন জানিস্ তো ? শোভাষ বাবু নিরপরাধ তাই তার মুক্তি হয়েছে, কিন্তু শান্তি যে সাধ্বী তার তো কোন প্রমাণ হয় নি ! দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে কখনো ঘরে রাখ্‌তে নাই, রাখ্‌লে দেশের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি ও

দুর্নাম। ভালো চাস্‌তো যা বল্লেম্‌ তাই কর্‌গে, আর বিলম্ব করিস্‌নে।

নিস্তারিণীর এইসব কথা শুনিয়া—রমেশ ও দীনেশ কাঁদিতে লাগিল, শান্তি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নিস্তারিণীর পা জড়াইয়া ধরিল, এসব দেখিয়া রমেশ ও দীনেশের স্ত্রী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না তাহারাও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু "ভবি ভোলবার নহে"। স্বার্থ-সিদ্ধি যার মনস্কামনা সে কি আর ক্রন্দনে ভোলে? অপর কেহ হ'লে তো তাহাদের ক্রন্দনে যোগদান করিত সন্দেহ নাই। নিস্তারিণী চোখ লাল করিয়া, সজোরে শান্তির হাত থেকে স্বীয় পদদ্বয় সরাইয়া লইলেন এবং ক্রোধ কম্পিত স্বরে শান্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রে পাপিয়সি"। দ্বিচারিণী! অপকর্ম্ম কর্‌বার বেলায় মনে থাকে না, এখন দায়ে প'ড়ে মায়াকান্না কাঁদ্‌তে ব'সেছিস্‌। আমি সব বুঝিগো আমি সবই বুঝি। হতচ্ছাড়া মেয়ে দেশশুদ্ধ লোকগুলিকে জ্বালাতন ক'রে তু'লেছিস্‌, আমার পাদস্পর্শ ক'রে আমার শরীর পর্য্যন্ত কলুষিত কর্‌লি। ওসব মায়াকান্নায় আর চল্‌বে না। যা বল্লেম তা এখনি কর্‌গে, এখনি এ বাড়ী ছেড়ে, এদেশ ছেড়ে যেখানে মন চায় সেখানে চ'লে যা, রমেশ ও দীনেশকে আর জ্বালাস্‌নে, দেশটাকে আর কলুষিত করিস্‌নে। বেড়ো, বেড়ো এখনি বেড়ো নতুবা দেখা যাবে এরূপ বলিতে বলিতে মত্তহস্তিনীর ন্যায় দ্রুত পদবিক্ষেপে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; রমেশ ও দীনেশের

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কোনও পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেও বোধ হয় এরূপ ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয় না। নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী অনেকেই এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিল কিন্তু পাছে সমাজচ্যুত হইতে হয় এই ভয়ে কেহই উহাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়া উহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেও সাহসী হইল না।

নিস্তারিণী যখন দেখিল যে ঘোষেদের বাড়ী থেকে তাকে আর দেখা যায়না তখন মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে হাসিতে মৃদুমন্দ গতিতে হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাটী পৌছিবা মাত্র তাহার হাসির ফোঁয়ারা ছুটিল এত হাসি যে তা আর থামে না। তাহার স্বামী বৃদ্ধ ন্যায় বাচস্পতি মহাশয় কোন একটী ন্যায়ের মীমাংসায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, কাজেই এই অট্টহাসির শব্দও তাহার কাণে পৌছিলনঃ। নিস্তারিণী তখন মনে করিলেন বুড়ো বুঝি শ্রবণ শক্তি হারা হয়েছে নতুবা এই হাসির শব্দ এখনো তাহার কাণে পৌছিলনা ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক প্রকাশ্যে স্বামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ওগো! তুমি কি বাড়ীতে আছ? ওগো! তুমি কি বাড়ীতে আছ? দুইবার এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন কর্‌রায় বাচস্পতি মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল তিনি যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন ষাঁড়ের মত এতক্ষণ গর্জ্জন কর্‌ছিলে কেন?

নিস্তারিণী—হা! এত বড় কথা! আমাকে ষাঁড় বল্‌ছো। আমি মেয়ে মানুষ, ষাঁড় হচ্চে পুরুষ। আমি মানুষ, আর ষাঁড়

হচ্চে পশু। আমি ভাত খাই আর ষাঁড় ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করে। তোমার এত বড় কথা যে আমাকে একবারে ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করছো ?

বাচস্পতি—করবো না তো কি, একশত বার করবো। তুলনা হয় বলিয়াইতো তুলনা কর্‌ছি, নৈলে করবো কেন ?

নিস্তারিণী—তুলনাটি হচ্চে যেন সেই গোল আলু, দালান হাতীর মত।

বাচস্পতি —সে কেমন ? আমাকে ঠাট্টা করা হচ্চে দেখ্‌ছি। স্বামীকে ঠাট্টা না করলে ঠাট্টা আর কর্‌বে কাকে ? "পতি পরম গুরু" এই কথা লিখিত চিরুণীটি কবরীতে পরিধান করার সাধটাতো এখনো পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান। এই কি তাহার ফল ?

নিস্তারিণী--আমি তোমাকে ঠাট্টা করিনি। তোমার তুলনা পদ্ধতিকে ঠাট্টা করেছি মাত্র। তোমাকে ওরূপ তুলনা কর্‌তে দেখে আমার গোল-আলু, দালান, হাতী এই তিনটার কথা বহুদিন পরে মনে পড়েছে, যদি রাগ না কর তবে বলিতে পারি। আমি খুব ছোট বেলায় আমার দিদিমার কাছে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম।

বাচস্পতি—গল্পটি বল দেখি ? তবে শুন, এই বলিয়া নিস্তারিণী গল্প স্বরু করিলেন।

নিস্তারিণী—এক দেশে কতকগুলি মূর্খ লোক বাস করিত, এরূপ মূর্খ আর কোথাও ছিলনা। এই মূর্খদের মধ্যে যে একটু বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, তার একদিন ইচ্ছা হলো যে সে একবার

বিদেশে যায়, এবং কোথায় কি আছে বিশেষ ক'রে দেখে আসে। তাই একদিন সে ভাল দিন দেখে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। যাইতে যাইতে সে নিকটস্থ এক সহরে উপস্থিত হইল। সহরের বড় বড় রাস্তা, গাড়ী ঘোড়া, দালান-কোঠা ও আর আর কত কিছু দেখিয়া মাঝে মাঝে সে অবাক হইয়া হাবার মত দাঁড়াইয়া থাকিত, কারণ, ওগুলি কি সে তাহা কিছুই জানিতনা। যাহা হউক অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এটা দালান, এটা গাড়ী, ওটা ঘোড়া এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইল। আরো কিছু দূর যাইতে যাইতে সে একটা বাজারে উপস্থিত হইল। বাজারটা প্রকাণ্ড। তরকারীর বাজারের একস্থানে গোলআলু স্তূপীকৃত দেখিয়া অপরের সাহায্যে উহার পরিচয় জানিল। এইরূপে হাতীর ও পরিচয় প্রাপ্ত হইল, কিন্তু বাড়ী প্রত্যাগমনকালে সকলগুলির কথা বিশেষরূপে তাহার মনে রহিলনা। মনে থাকিল কেবল গোল-আলু, দালান এবং হাতীর কথা। দেশে আসিয়া সে এর কাছে, ওর কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া বেশ সমাদর প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সকলেই তাহাকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিল। এইভাবে কয়েক মাস গেল হঠাৎ একদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর হস্তী আরোহণে ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া শিকার করিতে যাইতেছিলেন। হাতী দেখিয়া সকলে অবাক হইল, প্রকাণ্ড শুণ্ড, মোটা মোটা পা, অতি স্থূলদেহ ইত্যাদি দেখিয়া কেহই স্থির করিতে পারিল না ওটা কি। অবশেষে ঐ গ্রামের কয়েকজন মিলিয়া পূর্ব্ববর্ণিত লোকটীর

বাড়ীতে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল এবং ঐ জীবটী কি তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু গোল-আলু, দালান, হাতী এই তিনটীর কথা তাহার স্মরণ থাকিলেও কোন্‌টীর স্বরূপ কি তাহা তাহার আদৌ মনে হইতেছিল না। কোনরূপ উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকাও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে মনে করিয়া অমনি বলিয়া উঠিল। "এটী নিশ্চয়ই গোল-আলু"। নির্ব্বোধ গ্রামবাসিগণ গোল-আলু কখনো দেখে নাই, দেখা দূরের কথা, নামটীও শোনে নাই, কাজেই বুদ্ধিমান মাতব্বরের কথায় হাতীকেই গোল-আলু বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং প্রকাশ্যে তাহার ভূয়োদর্শনাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করিল। কেহ কেহ গোল-আলুর শরীর মোটা, গাছের মত মোটা মোটা পা এইভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল, পাছে বা গোল-আলুর আকৃতি, প্রকৃতি ভুলিয়া যায়।

বাচস্পতি মহাশয় এতক্ষণ মনে মনে কোন একটী ন্যায়ের মীমাংসাই করিতেছিলেন, কাজেই একাগ্রচিত্তে গল্পটীর আগাগোড়া শুনিতে পান নাই। যখন শেষ মীমাংসায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি গল্পটীর শেষভাগ মাত্র অর্থাৎ "হাতীকেই গোল-আলু বলিয়া বিশ্বাস করিল"। এই কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তিনি নিস্তারিণীর মুখপানে নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন।

নিস্তারিণী—চেয়ে রইলে যে?

বাচস্পতি—চেয়ে থাক্‌বোনাতো কি? এমন গাঁজা খুঁরে গল্প কোথায় শু'নেছ? গোল-আলু, দালান, হাতী এই তিনটীর

পরস্পরের কোন সাদৃশ্য আছে নাকি যে তুলনা হইতে পারে ?

নিস্তারিণী--আমাকে ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে পার আর ঐ তিনটীর পরস্পরের কোন তুলনা হইতে পারেনা—কি আশ্চর্য্য ! আমি কি চতুষ্পদ, না আমার শিং আছে ?

বাচস্পতি—হো ! হো ! হো ! মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই "মানুষ" হয় এই কথা স্বীকার করা যায়না। পশু-প্রবৃত্তিগুলি যার মধ্যে বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান সে-ই নররূপী পশু। সে কখনও মনুষ্য নামের যোগ্য নয়।

নিস্তারিণী—পশু-প্রবৃত্তিগুলি কি কি এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে এসকল জয় করা যায় তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলিয়া দিলে বড়ই সুখী হ'তেম।

বাচস্পতি—তোমার এই প্রশ্নটী শুনিয়া আজ বড়ই আনন্দিত হইলাম, এরূপ আনন্দ জীবনে কখনও উপভোগ করি নাই। প্রশ্নটী কঠিন হইলেও আমি সহজেই তোমার সংশয় অপনয়ন করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি। যাহা বলি তাহা তুমি মনোযোগ দিয়া শুনিলে আমি আরও সন্তুষ্ট হইব।

নিস্তারিণী—অত ভূমিকার কি দরকার ? তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনিতেছি।

বাচস্পতি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—হিতাহিত-বিচারশক্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এই

বিচারশক্তি বিহীন হইলেই মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়, তখন আর তাকে মানুষ বলা চলে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপুর কোন একটীর বশীভূত হইলেই মনুষ্য ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়, তখন তাহাতে ও পশুতে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেকটী প্রবল হইলে তো কথাই নাই। এই কয়টি রিপুর মধ্যে ক্রোধই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানিবে কারণ ক্রোধ হইতেই মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয় এবং অজ্ঞানতাই সমস্ত অনর্থের সৃষ্টি করে। বিষয়াদি ভোগেচ্ছার নাম কাম, এই কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা হইতেই মদ বা মত্ততা জন্মে, মত্ততা জন্মিলে মন আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেনা, তখন লোভ আসিয়া মনকে অধিকার করিয়া বসে। লোভী ব্যক্তি রুগ্ন, লম্পট ও চোর হইয়া থাকে। •মাৎসর্য্য রিপুটীও কম নহে। মাৎসর্য্যশীল বা মৎসর ব্যক্তি দাম্ভিক ও পরদ্বেষী হয়। পরের সুখ দেখিলে তাহার কষ্টের অবধি থাকে না, পরের উন্নতি তার ভাল লাগেনা বরং কিরূপে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে এই চিন্তায়ই সে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া আপনি কষ্ট ভোগ করে। মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদের কথা পড়িয়াছ তো? পাণ্ডবদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কৌরবদের চক্ষুর শূল হইয়া উঠিল। কিরূপে পাণ্ডবদিগকে নির্য্যাতিত করিবে, কৌরবেরা প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল, অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কপট পাশায় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্যচ্যুত ও বনবাসে নির্ব্বাসিত

করিল, পাণ্ডবপত্নী রজাস্বলা দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজ-সভায় বিবস্ত্রা করিয়া লজ্জা দিতে প্রয়াস পাইল, পাণ্ডবদের উচ্ছেদ-সাধনার্থ যতুগৃহ নর্ম্মাণ করতঃ কৌশলে তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে দিয়া গভীর নিশীথে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে মনস্থ করিল এইরূপ আর আর কত কিছু করিল কিন্তু পাণ্ডবদের উচ্ছেদ-সাধনে সক্ষম হইল কি? যাঁহারা ধর্ম্ম-ভীরু, ধর্ম্মই যাঁহাদের জীবন, ধর্ম্মই যাঁহাদের লক্ষ্য, ধর্ম্মই তাঁহাদের সহায় হইয়া সকল বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। কার সাধ্য তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করে। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় অবধারিত। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ইহাদের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। কৌরবেরা সংখ্যায় অসংখ্য হইলেও অল্প সংখ্যক পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাম রাবণের যুদ্ধে ও রাবণের সবংশে নিধন হওয়া অধর্ম্মেরই ফল। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপুদিগকে জব্দ করিতে হইলে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে হইবে। সাধুসহবাস, সদালাপ শ্রবণ ধর্ম্মজীবন লাভের প্রথম ও প্রধান সোপান। পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তন অন্তর বিশোধিত করিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রাতঃস্নানান্তে পুষ্পচয়ন ও ঈশ্বর-বন্দনা ধর্ম্মজীবন লাভের অপর প্রধান সোপান বলিয়া জানিবে।

নিস্তারিণী—তোমার উপদেশে আমার অনেক সংশয় অপনীত হইল। আমি দেখিতেছি অজ্ঞানতা হইতেই প্রায় সমস্ত অনর্থের

সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমি অজ্ঞানতা বশতঃ জীবনে যত অপকর্ম্ম করেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত অপকর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে আমার হৃদয় এখন দগ্ধ হইতেছে। প্রভো! আমাকে বলিয়া দাও কি উপায়ে আমি এই অন্তরগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইব।

বাচস্পতি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরমেশ্বরের নাম-কীর্ত্তনে অন্তর বিশোধিত হয়; ইহা কি ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গেলে? দিবানিশি তাঁহারই নাম জপ কর, অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইবে। যিনি পতিত-পাবন, অগতির গতি, তাঁহার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় লইলে ভব-ব্যাধি পর্য্যন্ত বিদূরীত হয়, সামান্য অন্তর্জ্বালার তো কথাই নাই। আর এক কথা—কুকার্য্য করিয়া অনুতাপ জন্মিলে তাহাকে শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত বলে। প্রায়শ্চিত্ত হইলে আর শরীরে কোনরূপ ব্যাধি থাকিতে পারে না। তোমার কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, অতএব নিশ্চয় জানিও যে তোমার পাপ বিমোচনের দিন অতি নিকটবর্ত্তী। সংগোপিত দুঃখের কথা একে একে অপরের নিকট মুক্তভাবে প্রকাশ করিলে যেমন হৃদয় যাতনার সম্যক লাঘব হয়, স্বকীয় পাপাচরণের কথা ক্রমে ক্রমে খুলিয়া বলিলেও অন্তর তেমনি পরিষ্কৃত হয়, ভিতরের গলদ সেরূপ বাহির হইয়া যায়। এখন বল দেখি তুমি কি কি পাপাচরণ করিয়াছ? আমি শুনিলেই বুঝিতে পারিব প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে কি না।

স্বামীকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিস্তারিণী দেবী অকপটে তাঁহার পাপাচরণের কথা একে একে বলিতে লাগিলেন এবং এক একটী কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল।

(১) চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়। তুমি আমাকে যেভাবে চলিতে শিক্ষা দিয়াছিঁলে আমি প্রথমতঃ ঠিক সেই ভাবেই চলিতে ছিলাম। এই ভাবে চারি পাঁচ বৎসর বেশ কাঁটিয়া গেল, কোনরূপ অসুবিধাই বোধ করি নাই কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ক্রমে আমার মাথা বিগড়াইয়া গেল, আমি ভাল ভাল অলঙ্কার, সেমিজ, কামিজ, বডিস্ আর কত কি রকমারি জিনিষের অভাব বিশেষরূপ অনুভব করিতে লাগিলাম। দেশী মোটা কাপড় আমার কাছে বড় ভারী বোধ হইতে লাগিল, এতভারী যে স্নানান্তে পুকুরের জল হইতে তীরে উঠিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, তার পরে সেই কাপড় কাচা এক অদ্ভুত ব্যাপার! জল হইতে কাপড়খানা টানিয়া তুলিতে পারি না, কষ্টে স্ষ্টে পারিলেও তাহা নিংড়াইয়া জল শূন্য করিতে পারি না যেন হাত ভাঙ্গিয়া আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। ও পাড়ার বোসেদের রাঙ্গা বৌ, ঘোষেদের সেজ বৌ, বারুয্যে বাড়ীর মেয়েদের পরণে পাতলা ফ্যালফেলে ঢাকাই সাড়ী, এবং তন্নিম্নে সেমিজ, সেপ্টি-পিন্ আটা কামিজ, বডিস যার নাম আমার চৌদ্দপুরুষে কখনো শুনে নাই, তদুপরি গলায় দড়িহার,

মাথায় শিতিপাটি, হাতে বালা, বাহুতে মোটা মোটা অনন্ত এসকল দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনোকষ্ট প্রথমতঃ হৃদয়ে চাপিয়াই রাখিয়াছিলাম, তোমার কাছে মুখ ফুটিয়া বলি এমন সাহস আমার তখনো হয় নাই, কারণ তখনো আমি অধঃপাতে যাই নাই। মন খারাপ থাকিলে শরীরও খারাপ হয়। কাজেই আমি দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন আমাদের প্রতিবেশিনী বর্ষিয়সী মনোতোষিণী ঠাকুরুণ আমার শারীরিক ও মানসিকাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাকে বলিলেন—কিলো নিস্তি! তুই বুঝি এখনো কিছু আদায় করিতে জানিস্ নি এতদিন তবে কি করিলি? বলা বাহুল্য তিনি আমাকে অলঙ্কারাদি কিরূপে স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিতে হয় তাহা বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়া গেলেন, আমি ও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমি তোমার অর্থাভাব দেখিলাম না, তুমি যে অলঙ্কারাদি দিতে অক্ষম একথা একটুকু ও ভাবিলাম না, তুমি যে ওসব কিছু দিতে না পারিয়া নিজেই কষ্ট বোধ করিতেছ। একথা আমার মনে একবার ও উদিত হইল না। আমি তখন পরশ্রীতে কাতরা, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্না কাজেই ও সব বিচার করার ক্ষমতা আমার মোটেই ছিল না, আমি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। অলঙ্কারাদি মনোরম জিনিষকেই আমি শ্রেষ্ট বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে সকল সময়ই আমি উহার ধ্যান করিতে লাগিলাম, যে ভাবে আমি তন্ময় হইয়া

পড়িলাম সেইভাবে ঈশ্বরকে ডাকিলে পরকালের কাজ হইত, নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন মিলিত। আমি আসল ভুলিয়া নকলে আত্মসমর্পণ করিলাম, নরকের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত লইলাম।

একদা রাত্রিতে আহারান্তে তোমার সহিত শুইয়া আছি, রোজ রোজ যেমন শুইয়া থাকি তেমন ভাবে নয়, এবং একটু স্বতন্ত্রভাবে শুইয়া আছি দেখিয়া তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে নাকি? কথা কও না কেন? তুমি আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলে কিন্তু আমি কোনও উত্তর না দিয়া কেবল ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তুমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কাঁদ কেন? বলনা চাও কি? আমি কৃত্রিম কান্না ত্যাগ করিয়া শুধু একজোরা অনন্ত ও একজোরা বালা দাবী করিলাম। অর্থাভাব প্রযুক্ত তুমি তাহা দিতে অক্ষম বলিয়া আমাকে জানাইলে আমি আরও কাঁদিতে লাগিলাম, সেই রাত্রিতে তোমার সঙ্গে আর কোন কথাই কহিলাম না, তুমি কত অনুনয়, কত বিনয় অবশেষে, বলিতে, এখন লজ্জা বোধ হয় আমার পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত করিলে কিন্তু আমি তখনও নিরুত্তর, এমন কি তৎপর ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত তোমার সহিত কোন কথাই কই নাই। আমাকে নাছড়বান্দা দেখিয়া আমার মনস্তুষ্টি সাধনাভিপ্রায় কতকগুলি থালা, ঘটি, বাটী এবং আরও কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ বিক্রয় করিয়া একজোরা বালা ও একজোরা অনন্ত তৈয়ার

করিয়া দিয়াছিলে। এখন সেই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমার বুক চিড়িয়া দেখ, দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ধিক আমাকে! ধিক আমার জীবনে। প্রভো! দয়াময়! দীনবন্ধু হরি! আমাকে নেও, আমাকে নেও, এপাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর—ন—ই—লে—এ—

নিস্তারিণী এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছা গেল, আর কিছুই বলিতে পারিলনা যাহাহউক স্বামীর সযত্ন শুশ্রূষায় প্রায় একঘণ্টা পরে নিস্তারিণীর চৈতন্য-সঞ্চার হইল এবং সেই দিনের জন্য এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা স্থগিত রহিল। পরদিন নিস্তারিণী আবার বলিতে লাগিল—

একদিন বিকালবেলা পশ্চিম পাড়ায় রামধন বারুয্যের বাড়ী বেড়াইতে যাইয়া দেখি রামধন বাবুর পুত্রবধু নির্ম্মলা সুন্দরী ইজি-চেয়ারে বসিয়া "আরোব্যোপন্যাস" পাঠ করিতেছে। আমি অভিনিবেশ সহকারে তাহার উপন্যাস পাঠ শুনিতে লাগিলাম। গল্পগুলি আমার নিকট এতই ভাল লাগিতে লাগিল যে আমি সহজে উঠিয়া আসিতে পারিলাম না। সেইদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আমার বিশেষ বিলম্ব হইয়াছিল, রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালীয় গৃহ কার্য্য বাধ্য হইয়া তুমিই সম্পন্ন করিয়াছিলে। রান্নাটা ও শেষ করিতে ক্রুটী কর নাই। বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আমার বিলম্ব দেখিয়া তুমি মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছিলে, তাই উপহাস

করিয়া আমাকে বলিয়াছিলে রান্নাবান্না সব প্রস্তুত, এখন খাও এসে। একথায় আমার কোন লজ্জা বোধ না হ'য়ে মনে বড়ই অভিমান জন্মিয়াছিল। অভিমানে রান্না ঘরে প্রবেশ ও করিলাম না, বিছানায় এসে অম্নি সটান হ'য়ে পড়িলাম। খাবার জন্য তুমি আমাকে কত সাধ্য সাধনা কল্লে। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাতও করি নাই। অনাহারেই সেই রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। আমি না খাওয়ায় তুমি ও আহার করো নাই। আহা! সেদিন যে তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি তাহা তখন একটুকুও বুঝিতে পারি নাই। এখন ওসব স্মরণ করিয়া দুঃখ দাবানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। উঁ—হুঁ—হুঁ! কি জ্বালা! কি যন্ত্রণা!! যদি বুক চিড়িয়া দেখাইবার হইত, তবে দেখাইতাম ভিতরে আগুণ কেমন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। হে স্বামিন্! হে দেব! যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, বাঁচিনা, বাঁচিনা, মলেম্, মলেম্। হে দেব! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, তুমিই আমার ব্রত, তুমিই আমার তীর্থ, তুমিই আমার পরমা গতি। না বুঝিয়া, সদাসৎ না ভাবিয়া, আপাতঃ মধুর বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তোমাকে নানারূপ কষ্ট দিয়া এখন যে মরম যাতনা ভোগ করিতেছি তন্নিবারণ কল্লে তুমিই একমাত্র উপায়। হে গুরো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। হে প্রভো! তুমি আর আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিলে নরকেও যে আমার স্থান নাই, অতএব আমার শত অপরাধ ভুলিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর অন্যথা

যেন এখনি আমার মৃত্যু হয়। স্বামীকে বাক্যবাণে ও নানারূপে কষ্ট দিয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুই অধিকতর শ্রেয়ঃ। যে জীবনে একদিনের তরে ও স্বামী-সেবা করে নাই. এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর মনোরঞ্জনের প্রয়াস পায় নাই, তার জীবন ধারণে ফল কি ?

এইরূপ খেদোক্তি করিতে করিতে নিস্তারিণী স্বামীর পদ-যুগলোপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বহুদিন, অনাবৃষ্টির পর অকস্মাৎ এক দিন বারিপাত হইলে যেমন অবিরাম ধারায় হইতে থাকে এই অশ্রু-বর্ষণও যেন ঠিক তেমনি। অশ্রুজলে নিস্তারিণী স্বামীর চরণ বিধৌত করিতে লাগিল তবু কান্না থামে না, যেন অফুরন্ত। নারীণাং রোদনং বলং অর্থাৎ রোদনই স্ত্রীলোকদের প্রধান বল। নারীর রোদনে ত্রিভুবনের অধীশ্বরও বিচলিত হয়েন। নারীর কটাক্ষে মুনির মনও টলটলায়মান হয়। সামান্য বাচস্পতি মহাশয় কোন্ ছার ? যেই নারীর এত ক্ষমতা, এত বল কে বলে সেই নারী অবলা ? স্ত্রীর ক্রন্দনে বাচস্পতি মহাশয়ের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি এতক্ষণ নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন কিন্তু এখন আর পারেলেন না এবং তিনি ইহার জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত।

উভয়ে কতক্ষণ এইভাবে অবস্থিত ছিলেন তাহা বলা যায় না, কিন্তু অনেকক্ষণ যে এইভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

স্ত্রীর ক্রন্দন উপশমিত হইলে বাচস্পতি মহাশয় নিস্তারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রেয়সী! তুমি যখন হৃদয় খুলিয়া তোমার অপরাধ স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি নিশ্চিতই ক্ষমার যোগ্যা। তোমার শত অপরাধ আজ আমি ক্ষমা করিলাম, আশা করি এবং আশীর্ব্বাদ করি তুমি অতঃপর খুব ভালভাবেই চলিবে এবং তোমার যশোরাশি পুষ্পের সৌরভের ন্যায় দিগন্ত পরিব্যপ্ত হইবে। আরও আশা করি যেন নারীকুল তোমার আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া ধন্য হইবে এবং আমাকেও ধন্য করিবে। এইরূপ কথোপকথনে সেই দিন রাত্রি অধিক হওয়ায় তাহারা উভয়েই সুখময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন রাত্রে যথাসময়ে আবার কথোপকথন আরম্ভ হইল। আজ রাত্রির কথোপকথনের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পূর্ব্ব রাত্রির মত কান্নাকাটি নাই, পা ধরাধরি নাই। অদ্যকার রজনী পূর্ণ-শান্তির রজনী। হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সরলমনে উভয়েই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। বাল্য জীবনে সেই বিবাহ সময়ের মুখ চন্দ্রিকার কথা, শুভরাত্রির কথা, মধুমাসের সমস্ত কথা, অতীত জীবনের অতীত সুখদুখের যাবতীয় কথা সরল মনে উভয়েই বলিতে লাগিলেন। মধুমাসে দিনের বেলায় অন্যের অলক্ষিত ভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাহি, চোখে চোখে কথা বলাবলি, রজনী আগমন-প্রতীক্ষায় অতিকষ্টে উভয়ের সময় কর্ত্তনের কথা, কোনটাই বাদ

পড়িল না। তারপর বর্ত্তমান জীবনের কত কত কথা, শান্তি-শোভাস-ঘটিত ব্যাপারের কথা আরম্ভ হইল।

বাচস্পতি মহাশয় নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন শান্তিবালা বাস্তবিকই দুশ্চরিত্রা? তার চরিত্র সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? যদি বাস্তবিকই সে দুশ্চরিত্রা না হয় তবে তৎসম্বন্ধে আমরা যে সব কার্য্য করিয়াছি তাহা কি সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত? যদি আমরা তৎসম্বন্ধে অন্যায় পথাবলম্বন করিয়া থাকি তবে তৎ-প্রতাকারের কোনই উপায় নাই কি?

নিস্তারিণী—আজ হঠাৎ আমাকে এ সকল প্রশ্ন করিলে কেন?

বাচস্পতি—আমার ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে শান্তিবালা সতী, শান্তিবালা সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী। তাহাকে আর তাহার ভাই রমেশ ও দীনেশকে তোমরা অনর্থক যে যাতনা দিয়াছ ও দিতেছ তজ্জন্য তোমরা সম্পূর্ণ দায়ী, ইহার ফল তোমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তবে এখনো সময় আছে, ইচ্ছা করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দুষ্কার্য্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার।

নিস্তারিণী—ইহাকেই দৈববাণী বলিয়া লোকে অভিহিত করে। দৈববাণী কি কখনো মিথ্যা হয়? শান্তিবালা সতী, শান্তিবালা নিরপরাধিনী ইহা আমরাও বিশ্বাস। তাহার চাল-চলন কথা-বার্ত্তা ও ব্যবহার দেখিয়া আমারও ওরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। আহা যে দিন আমি ওদের বাড়ী গিয়ে উহাদিগকে শাসাইয়া

আসিয়াছিলাম, সেই দিন বাছা আমার পায় ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিয়াছিল! সেই কথা এখন মনে করিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। ও না জানি মনে মনে আমাকে কত অভিশাপ দিয়াছে, তা না হ'লে এখন আমার হৃদয় এত ব্যথিত হইতেছে কেন? ওদের ধোপা, নাপিত, পুরুত বন্ধ করিয়া দিয়াছি, ওদের বাড়ী শুদ্ধ কেহ না যায়, এমন কি ওদের পুকুরের জল পর্য্যন্ত কেহ ব্যবহার না করে, ঢেঁড়া পিটাইয়া এসকল ব্যবস্থা করিয়াছি। কারাগার ও বোধ হয় এর চেয়ে অনেক ভাল। সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ওদের বাড়ীতে কেহ যায় না, ওদের সঙ্গে কথা বলে না। নিজ নিজ পুকুরের খারাপ জল ব্যবহার করে তবু কেহ ওদের পুকুরে জল আনিতে যায় না, ওরা কাহাকে ও মুখ দেখাইতে পারে না, অহো! ওদের কত কষ্ট! কত যন্ত্রণা! কিন্তু প্রতীকারের তো কোন পন্থাই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বাচস্পতি—পন্থা নাই কেন? পন্থাতো যথেষ্টই আছে। তুমি ওদের নিকট যেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর ঢেঁড়া পিটাইয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হউক যে ওরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং এক ঘ'রে হওয়ায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ধোপা নাপিত পুরুতকে বলিয়া দেওয়া হউক তারা যেন ওদের বাড়ীতে পূর্ব্বের মত কাজ করে।

নিস্তারিণী—বলা সহজ, কিন্তু করা কঠিন। আমরা এ ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে—এখন ফিরিবার সময় নাই।

বলিয়া কহিয়া ধোপা নাপিত পুরুতকে নয় বাধ্য করিলাম, যুবকদল ওরফে গ্রাম্য দেবতাদিগকে কিরূপে রাজি করা যাইবে। তারাতো আমাদের কথায় কর্ণপাত ও করিবে না বরং আমাদিগকে ঘুষখোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, নয় পাগল বলিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবে অথবা আমাদিগকেই একঘ'রে করিবে।

বাচস্পতি—চেষ্টা করিয়া দেখিতে আপত্তি বা বাধা কি? চেষ্টায় কিনা হয়? চেষ্টায় বাঘের চোখ মিলে এতো সামান্য কথা। গ্রাম্য দেবতারূপী যুবকবৃন্দ যদিচ আমাদিগকে একঘ'রে করে আমরা রমেশদের সঙ্গে যোগ দিব, আর ধোপা নাপিত পুরুতকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য করিতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পাইতেই হইবে না। সম্মুখে শারদীয়া পূজা, এখন হইতেই চেষ্টা করা যাক, নচেৎ এসকলের অভাবে বাছাদের পূজা পণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূজা পণ্ড হওয়ার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারিব না। যদি একান্তই পুরুতকে রাজী করিতে না পারি, তবে আমি নিজেই ওদের পৌরহিত্য করিব, তুমি কেমন মনে কর?

নিস্তারিণী—তোমার সুমতি হইয়াছে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। "ভাবিয়া করিবে কাজ, করিয়া ভাবিবে না" এই অমূল্য নীতির অনুসরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে আমাদিগকে কোন ঝঞ্ঝাটেই পড়িতে হইত না। যাহা হউক গতস্য শোচনা নাস্তি; যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিয়া অনুশোচনা করায় কোনই

ফল নাই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনো এরূপ ভাবে অনুশোচনা করেন না। আমাদের যখন মতি ও মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তখন ঈশ্বরানুগ্রহে অপরের পক্ষে ও ঐরূপ হইবে ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা। যেই কাজ সৎ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সূচনা করিতে ক্ষণমাত্র ও বিলম্ব করা উচিত নয় করিলে, স্বর্গদ্বারে পৌঁছিবার জন্য রাবণের সিঁড়ি প্রস্তুতের কল্পনা যেমন কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল কখনো কার্য্যে পরিণত হয় নাই, আমাদের পক্ষে ও সেইরূপ হইবে। আহা! রাবণরাজা যদি সিঁড়ীগুলি প্রস্তুত করিয়া যাইতেন তবে বুড়া-বুড়ী আমরা তল্পি-বোচ্‌কা নিয়া কতকাল পূর্ব্বেই জীবদ্দশায় স্বর্গারোহণ করিতাম। আমাদের সোহাগের সামগ্রী বিড়ালটীকে ও সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিতাম না।

বাচস্পতি—দেখ কি সখঁ! স্বর্গে যাবে তাও তল্পি-বোচ্‌কা নিয়ে কি আশ্চর্য্য! তা হ'লে পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা অমনি বলিয়া উঠিবে।

"বুড়ো-বুড়ী স্বর্গে যায় ছেঁড়াকাঁথা নিয়ে,
বিড়ালটীও সঙ্গে যায়, যায় আর টিয়ে।
মিণি করে মিউ মিউ, টিয়ে করে গান,
বুড়ো-বুড়ী দেখ অই, স্বর্গে যান।"

নিস্তারিণী—তোমার রসিকতা এখন ছেড়ে দাও, এখন রসিকতার সময় নয়, যা করবে মনে করেছ তাহাই করগে। আমি বল্‌ছি কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হবেই হবে।

বাচস্পতি—নারীগণকে লোকে সাক্ষাৎ "শক্তি" বলিয়া অভিহিত করে। শক্তি স্বরূপিনী তুমি যখন কার্য্যে উৎসাহ দিতেছ তখন সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

এই বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় কার্য্যরম্ভ করিলেন। সৎ যাঁর উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন এবং কার্য্যে সফলতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ ঘোষেদের বাড়ীতে যাইয়া শান্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, রমেশ ও দীনেশকে ডাকিয়া তাহাদিগকে কতরূপ প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন, কত আশ্বাস দিলেন। তাহারা অবাক হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটী কথাও বলিতে পারিল না। আনন্দাতিশয্যে বোধ হয় এরূপই হইয়া থাকে। ধোপা নাপিত ও পুরুহিতের বাড়ী যাইয়া তাহাদিগকে ও বিশেষরূপ বুঝাইয়া বলিলেন। তাহারা প্রথমতঃ তাহার কথায় কর্ণপাত ও করে নাই, বরং তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করিয়া তাড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে তাহারা সকলই পথে আসিল। বাচস্পতি মহাশয়, প্রথম উদ্যমে কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া সানন্দে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের—কার্য্যে সফলতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীও আসরে নামিলেন। তিনি মেয়ে মহলে এ পাড়ায় সভা করিয়া সকলকে তাঁহার ও তাহাদের ভ্রম বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন কেহ কেহ তাঁহার কথায় রাজী হইল, ঘোষ

পরিবারকে সদলভুক্ত করিতে কোনরূপ আপত্তিই করিল না কিন্তু অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। গ্রাম্য দেবতারূপী যুবকদল ক্রমে এসব বিষয় শুনিতে পাইয়া নিস্তারিণী দেবী ও তদীয় স্বামী বাচস্পতি মহাশয়ের উপর হাড়েঁ হাড়েঁ চটিয়া গেল। তাহারা কিরূপে বাচস্পতি মহাশয় ও তদীয় দলের লোকদিগকে জব্দ করিবে তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারিলেও বাচস্পতি মহাশয় ও তদীয় দলভুক্ত লোকদিগকে বয়কট্ করিল। ইঁহাদের সহিত যুবকদলের সামাজিক কোনরূপ সংশ্রবই রহিল না? বাচস্পতি মহাশয় ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপেই হউক সমাজের আমূল সংস্কার করিবেনই করিবেন, নতুবা দেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সুগৃহিণী নিস্তা-রিণী দেবীর পরামর্শ মতে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

একখানি জীর্ণ কুটীরে বসিয়া জনৈক বৃদ্ধ বেত তোলাইতে ছিলেন। মাঝে মাঝে বেত কাটিয়া যাইতেছিল, আর তিনি চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইতেও ছিলেন। তিনি কখনো দাঁ কে কখনোবা বেতকে কখনোবা উভয়কেই এজন্য দায়ী করিতেছিলেন, পরিশেষে দাঁ কেই সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করিলেন। দাঁএর নির্ম্মাণকারী চৌদ্দপুরুষকেও গালি দিতে ত্রুটী করেন নাই। নাচতে না জান্‌লে উঠানের দোষ এই প্রবাদ বাক্যটী এক্ষেত্রে হাঁড়ে হাঁড়ে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তিনি দাঁ কে প্রধান দোষী সাব্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তিনি উহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডেও দণ্ডিত করিলেন এবং যেই বেতগুলি নিয়া তিনি কাজ করিতেছিলেন সেইগুলিকে কাজের অনুপযুক্ত মনে করিয়া বরখাস্ত করিলেন। আজকাল কোন একটী কাজ খালি হইলেই যেমন শত শত প্রার্থী আবেদন পত্র হস্তে সতৃষ্ণনয়ন চাতকের মত আশার আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে, এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটী না হইলেও নির্ব্বাচন ব্যাপার অনেকটা তদনুরূপ হইয়াছিল। তাহার ঘরে আরও পাঁচটা দাঁ কর্ম্মখালির প্রতীক্ষায়ই যেন অপেক্ষা করিতেছিল এবং কয়েকটা আসাম-জাত বেতও ছিল। এ সময়এইগুলির উপর বৃদ্ধের নজর পড়িল। তিনি তন্মধ্য হইতে একখানা ভাল দাঁ এবং কয়েকটী টাট্‌কা বেত বাছিয়া লইলেন। পাঠক পাঠিকাগণ ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন কি? ইনি

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মহাশয় ব্যতীত আর কেহই নন্। ইঁহাকেই পাড়ার ছেলে মেয়েরা বিয়ে পাগলা বুড়ো এবং মাগ্-খেকো বুড়ো এই দুইটী আখ্যা প্রদান করিয়াছিল এবং একমাত্র ইনিই শান্তির দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিলেন এবং ইনিই একাকী মরিয়া হইয়া এতৎ সম্পর্কে গ্রামের লোকদিগের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি নূতন মনোনীত দাঁ ও বেত লইয়া পুনরায় সোৎসাহে কার্য্যারম্ভ করিতে যাইবেন এমন সময়ে বাচস্পতি মহাশয় তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয় দাঁ ও বেত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বসিবার জন্য যথোপযুক্ত আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গরীবের বাড়ী হাতীর পারা যে? পথ ভুলে এলেন নাকি? যাঁকে আরাধনা ক'রে পাওয়া দুষ্কর তিনি স্বয়ং আমার জীর্ণ কুটীর দ্বারে উপস্থিত! আমার বিশেষ সৌভাগ্যই বলিতে হইবে; পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই এইরূপ সৌভাগ্য সম্ভবে অন্যথা নহে। তবে কিনা আমার মনে বড় একটা খট্‌কা র'য়ে গেল" ঘোষ মহাশয় এবম্বিধ ভূমিকা করিয়া বাচস্পতি মহাশয়কে সবিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর! ব্রাহ্মণ, কায়স্থের দ্বারস্থ হয়, না কায়স্থ ব্রাহ্মণের দ্বারে উপস্থিত হয়? ব্যাপার খানা কি? কলিতে দেখি সবই উল্টা!

বাচস্পতি—কর্ত্তব্যানুরোধে সকলকেই সকল স্থানে যাইতে হয়, ইহাতে আর দোষ কি ?

হরিঘোষ—ঠাকুর ! আমি তোমার একথার সমর্থন করিতে পারিলাম না। কার্য্যানুরোধে সকলকেই সকল স্থানে যাইতে হয় এ কথা সর্ব্বতোভাবে ঠিক নহে, ঠাকুর ! তুমি একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

বাচস্পতি—তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনিতেছি, হরিঘোষ বলিতে আরম্ভ করিলেন—কার্য্য দ্বিবিধ সু আর কু, এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই সু আর কু এই দুইটী লক্ষণ বা অবস্থা বর্ত্তমান। তাই যদি হইল তবে সকল মানুষই একই চরিত্রের বা একরূপ একথা কখনও বলা চলে না। যিনি সৎ তিনি কখনও কুকার্য্য করিতে বা কুস্থানে গমন করিতে পারেন না, কোনরূপ কুভাবনাও তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি সর্ব্বদাই সদসৎ বিচার করিয়া কার্য্য করেন, কাজেই তিনি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন স্থানে যাইতে পারেন না। যেস্থানে তিনি কু বলিয়া মনে করেন সেইস্থানে তাহার গমন কখনো সম্ভবপর হয় কি ? কখনো নহে। আর যে ব্যক্তি অসৎ, অসৎ কাজ যার চিরাভ্যস্ত, সে কখনো সৎকাজে মনোনিবেশ করে কি ? করিতে পারে না, কাজেই করে না।

আচ্ছা, বুঝিলাম, তুমি সৎ, তাই অসৎকাজ করিতে কোন মতেই সমর্থ হও না, কিন্তু অসৎ ব্যক্তির পক্ষে তো এ নিয়ম খাটে না।

বাচস্পতি—তুমি তো বড় একজন নৈয়ায়িক হয়েছে, দেখ্‌ছি। তোমার কেবলই উল্টা তর্ক, কেবলই উল্টা তর্ক। দেখহে, একটু সরল হ'য়ো, সোজা পথ ধ'রে চলিও কারণ সরল না হ'লে মন পরিষ্কার হয় না, মন পরিষ্কার না হ'লে হৃদয় পবিত্র হয় না, হৃদয় পবিত্র না হ'লে উত্তমাগতি-লাভ হওয়া অসম্ভব।

হরিঘোষ—আমি ন্যায়-শাস্ত্র কখনো পাঠ করি নাই, তবে এই টুকু বুঝি যে যাহা সৎ তাহা ন্যায় আর যাহা অসৎ তাহাই অন্যায় বা ন্যায়-বিরুদ্ধ, কিন্তু ঠাকুর! আমি এইটুকু বুঝিতে পারিলাম না যে, শান্তিবালাকে জব্দ করিবার জন্য তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা সরল কিম্বা ন্যায়ানুমোদিত কি না।

বাচস্পতি—তা ভাই, তা ভাই সাময়িক উত্তেজনা-ফল হঠাৎ একটা কাজ ক'রে ফেলেছি সেজন্য আমরা এখন উভয়েই বিশেষ অনুতপ্ত, তার উপরে ভাই তুমিও যদি অনুযোগ দেও, তবে আর আমরা দাঁড়াই কোথায়? তুমি বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী, তাই তোমার কাছে এসেছি, ভরসা আছে তোমার পরামর্শ মতে কাজ করিলে আমাদের দোষের ও নিরাকরণ হয়, ওরা ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ সমাজে চলিতে পারে।

হরিঘোষ—এখন বুঝ্‌লেম্, ঠাকুর তুমি কি জন্য এখানে পদার্পণ করেছ। এখন বুঝ্‌লেম্ বিশেষ না ঠেকে তুমি কখনো এখানে আস নাই। তোমরাই যত নষ্টের মূল। যেখানে দু'চার

টাকা বেশী দক্ষিণা মিলে, যেখানে সিধে বিদায়টা বেশ ভাল কোরে পাওয়া যায় সেখানে আর তোমাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যা তা একটা পাঁতি দিলে মহা কেলেঙ্কার ঘটা'য়ে দেও, শেষে শেষ-রক্ষা কোর্‌তে না পেরে এ'র কাছে ও'র কাছে যাও, এইতো তোমাদের স্বভাব। এজন্যইতো কেহ আর পূর্ব্বের মত, তোমাদের উপর আস্থাস্থাপন কো'রতে পারে না। ইহাইতো তোমাদের পতনের মূল। সেই বৈদিকযুগ আর এই যুগ একবার তুলনা করে দেখ দেখি? তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের অসীম ক্ষমতা ছিল, রাজারা পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ নাকো'রে এক পা অগ্রসর হো'তেন না। তাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির আশায় তাঁরা কি না কোরেছেন? সত্যকে আশ্রয় কো'রে আবার পূর্ব্ববৎ চলিতে থাক, সুদিন পুনরায় ফিরে আস্‌বে, দেখ্‌তে পাবে।

বাচস্পতি—এত ভূমিকার কি প্রয়োজন? ভ্রম বশতঃ যা একটা করে ফেলেছি তার জন্য ভর্ৎসনা করে এখনতো আর কোন লাভ নাই। আমি নিজেই যখন কৃত কার্য্যের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি, ও বিশেষরূপ অনুতপ্ত হয়েছি তখন আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করে মনে কষ্ট দেও কেন? যাক্ সে কথা, ভর্ৎসনা করতে চাও, যত পার কর, কিন্তু আমি যে জন্য তোমার নিকট এসেছি, তার সদুপায় কি?

হরিঘোষ—ঠাকুর! অত পাগল হ'লে চল্‌বে না। গাছের গোঁড়া কেঁটে আগায় জল ঢাল্‌লে কি চলে? আর বিশেষতঃ গ্রাম

শুদ্ধ লোককে যখন ক্ষেঁপিয়ে তুলেছ, ধোপা-নাপিত পুরুত পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে যখন শিশির ঘোষের পরিবারবর্গকে এক ঘরে করেছ তখন কেবল আমারই সাহার্য্যে তুমি কিরূপে তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণে সমর্থ হইবে? এটা কি কখনো সম্ভব? সম্ভবতো নই, বরং ভয়াবহ ফল হইবে।

বাচস্পতি—"দেখবো পাতাল কত দূরে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে কাজে অবতীর্ণ হব, সফলতা লাভ না হয়ে যায় কৈ? চেষ্টার ফলে অসীম সমুদ্র মথিত হয়, চেষ্টার ফলে সাগর ও বন্ধন দশায় পতিত হয়, চেষ্টার ফলে আকাশ পথে দেশ দেশান্তরে যাওয়া যায় চেষ্টার ফলে আরো কত কিছুই হয়, না হয় কি?

হরিঘোষ—যে চেষ্টার কথা তুমি বল্‌ছ, তাহা সকলের সমবেত চেষ্টাকেই লক্ষ্য করিতেছে, এক জন দুই জনের চেষ্টা নয়। পঙ্গু কখনো গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে কি? অন্ধ কখনো দৌঁড়িয়ে যেখানে সেখানে যাতায়াত করিতে সক্ষম হয় কি? আর বেশী দূর কেন যাই, স্বয়ং হরিঘোষ আমিইতো তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তোমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক ছিলে ঘোষ পরিবারের বিপক্ষে শান্তির বিপক্ষে, আর আমি ছিলাম একা তাঁদের পক্ষে, ফল কি হয়েছে তা'তো তোমরা জান, তবে শুধু আমাকে নিয়ে তুমি কেন যে এত টানা হেঁচ্‌রা কর্‌ছ তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আর দেখ, আমি বৃদ্ধ, সম্প্রতি গৃহশূন্য হইয়া দিবানিশি যে অশান্তি ভোগ কর্‌ছি তাহা ভগবানই জানেন, তোমরাও যে কিছু কিছু না জান তাও নয়, এমতাবস্থায় আমি যদি আবার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি, তবে আমার আর রক্ষা থাকিবেনা। গ্রামের যুবক বৃন্দও অন্যান্য লোকজন আমাকে একেবারে আস্ত গিলে ফেল্‌বে। লাভের মধ্যে এই হবে আমি যে আর এক বছর কি দু বছর বাঁচবো আশা করি তা আর হবে না। আমি যে দুটা খেতাব পেয়েছি, তার জ্বালায়ই সতত অস্থির, তাতে আবার তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ কর্‌লে আমার যে দশা হবে তা পূর্ব্বেই বলেছি, দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আমি একা বেশ আছি, দুদিন হউক, দশ দিন হউক, এক বছর হউক কি দু বছর হউক আমাকে একাই যে'তে হ'বে, সমাজ টমাজ্ কোন কিছুই সঙ্গে যাবে না। ভাই আমাকে ক্ষমা কর, আমি আর ওসব ঝক্‌মারিতে যেতে চাই না। আর কি নেঁড়ে বেলতলায় যায়?

বাচস্পতি—আমি তোমার বাড়ী এসেই যে লম্বা চওড়া ভূমিকা শ্রবণ করেছিলাম, তার পরিণাম কি এই? সাহার্য্য না করাই যদি তোমার অভিপ্রেত ছিল তবে অতবড় ভূমিকার তো কোনই দরকার ছিল না। সোজা কথায় বল্লেই হতো ভাই আমি পার্‌বো না, তুমি অন্য পথ দেখ।

হরিঘোষ—ভাই ! বেজার হয়োনা। সমাজ সংস্কার ব্যাপারটা মুখের কথা নয়। সমাজ ভাঙ্গা গড়া তোমার মত লোকের কাজ নয়, আর যদিই বা তাহা সম্ভব হয়, সেটা সমাজই নয়, সমাজের অপভ্রংশ দলাদলি মাত্র। এখনকার সমাজের যে অবস্থা তাতে ইহাকে সমাজ আখ্যা না দিয়ে দলাদলি বা শত্রুতা আখ্যায় অভিহিত ক'রলেই নামের সার্থকতা হয়।

বাচস্পতি—তুমি সমাজের উপর এতটা চ'টে গেলে কেন ?

হরিঘোষ—চটবোনা তো কি ? যেখানে মিথ্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সত্যের মর্য্যাদা মোটেই রক্ষিত হয় না তাও আবার সমাজ ? ও পাড়ায় শশীমিত্তির যিনি বিলাত গিয়ে কত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখে বিদ্বান হ'য়ে দেশে ফিরেছেন, সমাজে তার ঠাঁই হ'লোনা, অথচ যারা নিত্যি নিত্যি বারবনিতাগৃহে কত কাণ্ড কারখানা করছে তাদের আর জাত যায় না। কুকাজ ক'রে যে স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয়, সমাজে তার স্থান নাই। স্থান আছে শুধু তার যে ব্যক্তি সমাজ বিরুদ্ধ কাজ ক'রে, "ক'রেছে" ব'লে কখনো স্বীকার করে না, এবং স্পষ্ট কথায় বলে "আমি অমন কাজ করি নাই।" যে সমাজ সত্যকে বিতাড়িত করিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় সে কি সমাজ, তা তুমিই বিচার ক'রে দেখ দেখি ? ঘোষ পরিবারকে, শান্তিবালাকে সমাজ-চ্যুত করা সমাজের পক্ষে উচিত হ'য়েছে কি ?

আর শোভাস-কুসুম, যার সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব

রায়ে লিখলেন্ "ঘটনা সত্য কিন্তু প্রমাণাভাব" সেই শোভাস-কুসুম, শুধু সে কেন তার মত আরো কত কত দুশ্চরিত্রের লোক সমাজে অবাধে চল্‌ছে, তাদের তো সমাজ কিছুই বল্‌ছেনা ? এসব ক্ষেত্রে সমাজ যেন অন্ধ ! যতদিন এসমস্ত দোষ সমাজ হইতে দূরীকৃত কিম্বা সংশোধিত না হইবে ততদিন সমাজের আর মঙ্গল নাই, ততদিন আর আমার কাছে সমাজ-সংস্কারের কথা নিয়ে এ'সো না। দোষাদির সংশোধন করিয়া পুনর্গঠনের নাম সংস্কার, ব্যাপারটা সোঁজা নয়। আর দেখ, কোন কিছুর সংস্কার কর্‌তে হ'লে যাঁহারা সংস্কার কর্‌বেন তাঁদের পূর্ব্ব হইতেই সেই জন্য তৈঁয়ের হ'তে হয়। আগে নিজের সংস্কার কর, পরে অপরের সংস্কারে মন দেও, আগে নিজে ভাল হও, পরে অপরকে ভাল কর্‌তে চেষ্টা কর। নিজকে ভাল না ক'রে অপরকে ভাল কর্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এক অন্ধ কি কখনও অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে ? গুরুর মত গুরু হও, প্রকৃত শিষ্য আপনিই জুট্‌বে। নিজে না মজ্‌লে অপরকে মজান যায় না। ঠাকুর ! এখনো কি বুঝ্‌লে না ?

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যেমন রাজনীতি, আংশিকভাবে সমাজ-নীতিও কতকটা তেমন। রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, কিন্তু সমাজের কর্ত্তব্য ইহা হইতেও উচ্চতর। সমাজ লোকের চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি

রাখেন। যাতে লোক সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান হয় তদ্বিষয়ে সমাজের প্রখর দৃষ্টি। রাজ-শাসনে অসৎ লোক পুনঃ পুনঃ শাস্তি পাইয়াও চিরাভ্যস্ত দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হয় না দেখা যায়, কিন্তু সামাজিক শাসন এমন গুরুতর যে তৎপ্রভাবে দুষ্ট লোকও ক্রমশঃ শিষ্ট হইয়া সমাজের উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। সুশিক্ষাই চরিত্র গঠন ও সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ধর্ম্মমূলক শিক্ষাই সুশিক্ষা, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সুশিক্ষাই নহে, এবং এই শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর প্রকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আজকাল বালকবালিকাদের জন্য অনেক স্থানে স্কুল-কলেজ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষার নাম গন্ধও তাতে নাই, পাঠ্যতালিকায় কোনও ধর্ম্মগ্রন্থের নামও দেখা যায় না, বরং এসকল বিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে নানারূপ বিলাসিতা প্রবেশ-লাভে সমর্থ হইয়াছে। এসকল বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শত শত যুবকযুবতী বাহির হইতেছেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কিম্বা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত কোন লোকইতো বাহির হইতেছে না, ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয় নয় কি ?

যাহারা এখন বালিকা এবং পরিণামে যাহারা মা হইয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহারা যদি এ সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘর-কন্না শিক্ষা, সন্তান পালন শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষা-শিক্ষা

ও ধর্ম্মশিক্ষা পাইতেন তা হ'লে সংসার সুখময় হইত, অসুস্থ বা রুগ্ন শিশুর জন্ম হইত না, অকাল মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটা কমিয়া যাইত, এবং এই সকল লোক দ্বারা সমাজেরও বিশেষ উন্নতি হইত। প্রকৃত সমাজ-গঠন-পক্ষে এই সকল উপকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। হে ঠাকুর! যদি এরূপভাবে প্রকৃত সমাজ গঠিত করিতে চাও, তবে আমি মনে প্রাণে তোমার সহায়তা করিতে পারি, নতুবা কোনরূপ কেলেঙ্কারীর মধ্যে যাইয়া শেষ জীবনটা নষ্ট করিতে আমি কিছুতেই রাজি নহি। যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও তবে গ্রামের সকলকেই এই মহান্ কাজে ব্রতী করিবার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ক্রুটী করিব না ইহাও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতে পারি।

বাচস্পতি—কয় বৎসর বা বাঁচবো তা'তে এতগুলি কাজ করে সমাজের সংস্কার করা আমার পক্ষে কদাপি সম্ভবপর হইবে না।

হরিঘোষ—রোম-নগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, টেমস-নদীর সুরঙ্গ একদিনে তৈঁয়েরি হয় নাই। আগ্রার তাজমহল কি এক দিনে প্রস্তুত হইয়াছে? বড় বড় কাজ যত সবই কি এক দিনে হয়? সকলটাতেই সফলতা সময় সাপেক্ষ। এক দিনে সমাজ-সংস্কার কর, কিম্বা একাই এ কার্য্য সাধন কর আমি একথা বলিতেছি না। এই মহান্ কার্য্যে যে সময় ব্যয়িত হইবার প্রয়োজন তাহা লাগিবেই লাগিবে। যে সময় লাগে লাগুক, এক

বছরে না হয় দুই বছরে হ'বে, এক পুরুষে না হয় দুই পুরুষে হ'বে, চেষ্টা কর্‌তে বাঁধা কি ?

বাচস্পতি—ততদিন বা অতি দীর্ঘকালের সবুর আমার সহ্য হবে না। ছোট খাঁটো কাজে যাতে সমাজের কিছু না কিছু একটা উপকার সাধিত হয় তার কথা বল্লে একবার চেষ্টা কো'রে দেখ্‌তে পারি।

হরিঘোষ—(হি! হি! হি!) বেশ কথা তাই হউক, তবুতো হাত আসুক, পুরুষের এই যে অদ্ভুত চুলকাঁটার ফ্যাসনটা সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেল্‌ছে, যাতে সম্মুখের লম্বা লম্বা চুলগুলি সমস্তই থেকে যায়, পেছনটায় চুল প্রায়ই থাকেনা অথচ নাপিতকে এত-গুলি চুল রাখবার পুরস্কার স্বরূপ দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ পয়সা দিতে হয়, এটা ভাই নিবারণ কর্‌তে আগে চেষ্টা ক'রো দেখি।

এই কাজটা কর্‌তে পার্‌লে এই দারিদ্র-প্রপীড়িত বাংলা দেশের অনেক টাকা বেঁচে যাবে। ধর, যদি এক কোটী লোক এইরূপ ফ্যাসনে চুল-কাঁটা হইতে বিরত হয় তবে জনপ্রতি আধ আনা হিসেবে কম খর্‌চা হ'লেও প্রতি বৎসর অন্ততঃ কোটী টাকা বেঁচে যায়। এতগুলি টাকা দ্বারা কতগুলি গরিব লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় একবার ভেবে দেখ দেখি। ন্যূনকল্পে ৩৭ লক্ষ গরিব লোকের যে বার্ষিক অন্ন-সংস্থান হয় তার আর সন্দেহ নাই। অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ বঙ্গবাসীর পক্ষে এইরূপে অর্থ

ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া কেহ মনে করেন কি ? এইরূপ ফ্যাসনে চুলকাঁটায় সমাজের উন্নতি হয় কি ?

তার পরে ধর শার্ট প্রস্তুত করার ফ্যাসন। শার্ট ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে ইহাতে বোধ হয় কালে ইহা চরণের গোড়ালি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে, কিন্তু ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে নাপিতের ত্রুটী খলিপায় কতকটা সেরে নেয়। চুলকাঁটার ফ্যাসনে মাথার পেছনটায় যে চুলের অভাব থাকে সেই অভাবটী পূর্ণ করার মানসেই যেন খলিফা দ্বারা শার্টের পেছনটা অতিশয় দীর্ঘ করা হয় এইরূপ প্রতীতি জন্মে। এইরূপ ফ্যাসনে শার্ট প্রস্তুত করিতে যেই কাপড়টুকু বেশী খরচ হয় তাহা গড়-পড়্তায় প্রতি লোক পিছু চারি আনার কম নহে। এখন, প্রতি বৎসর এইরূপ ধরণে শার্ট প্রস্তুত করিতে সমস্ত লোকের কত টাকা অধিক ব্যয়িত হয়, ইচ্ছা করিলে তাহারও একটা হিসাব যে না করা যায় তাও নয়। এই অন্ন কষ্টের দিনে ব্যয়াধিক্য সঙ্কুচিত করিলে লাভ ছাড়া কোন ক্ষতিই নাই। বাচস্পতি ভায়া! তুমি এটার কি সংস্কার সাধন করিতে প্রয়াস পাইতে পার না ? আমি সাহার্য্য করিতে রাজি আছি, ঘাব্ড়াইও না।

তার পর ধর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কথা। পূর্ব্বে মোটা ভাত খেয়ে শরীর মোটা ও বলিষ্ঠ হইত, কিন্তু এখন ইহা সামাজিক হিসাবে অসভ্যতার মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় ভদ্রপল্লী হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের সরু বালাম ও

অন্যান্য স্থানের অত্যন্ত মিহি চাউল তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। এই অধিকার দুই এক বছরের জন্য নহে, চিরকালের জন্য। বিনা দোষে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় মোটা ভাতের অভিষাপ ও বেশ লাগিয়াছে। শরীরে তেমন বল নাই, তেমন হজম শক্তি নাই, ভালরূপ ক্ষুধা হয় না, আরও লাভ (?) দেখুন, অম্ল ও অজীর্ণ রোগে দেহ জীর্ণ শীর্ণ। যেই মোটা ভাত খাইলে শরীর মোটা হয়, শরীরে বল হয়, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ যাহা অল্প ব্যয় সাপেক্ষ তাহা খাইতে আমরা লজ্জা বোধ করি, তাহা খাওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করি, আর সেই বালাম চাউল বা সরু চাউল খাইলে শরীরে তেমন বল জন্মে না, শরীর অম্ল ও অজীর্ণাদি রোগের আকর হইয়া উঠে এবং যাহার মূল্য মোটা চাউলের তুলনায় অনেক বেশী তাহাই অম্লানচিত্তে খাইয়া থাকি, ইহার চেয়ে অধঃপতন আর কি হইতে পারে? ইহাকেই "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়" বলে না কি?

পূর্ব্বে মোটা কাপড় একখানা মাত্র পরিধান করিলেই লজ্জা-নিবারণ হইত, এখন সেই দিন আর নাই। পাতলা ফিন্ ফিনে কাপড় যাহাকে "উলঙ্গ-বাহার" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তাহাই এখন মোটা কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। তার আবার বাহার কত! একখানাতে কখনো লজ্জা নিবারণ না হওয়ায় সহকারী বস্ত্রের প্রয়োজন, সহকারী ও একটা হইলে প্রায় চলে না। এই বিষম পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে গৃহিনী বলেন, "আমার

শরীরে অত শক্তি নাই যে মোটা কাপড়ের ভার বহন করিতে পারি। কাচ্‌তে কষ্ট হয়, স্নানান্তে জল হইতে উপরে উঠা এক বিষম ব্যাপার হইয়া উঠে।" তিনি নজির দেখান্ দশ জনে মিহি কাপড় পরে, এমতাবস্থায় তাদের সহিত চাল-চলন, তাদের বেশ-ভূষা সবই অনুকরণ করিতে হয়, নৈলে চলেনা। যদিও মোটা কাপড়ের মূল্য কম ও উহা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন স্থায়ী তবু ভদ্রতার খাতিরে বহুদামি মিহি কাপড় পড়িতে হয়। মিহি কাপড় পরিয়া স্নান করিয়া উঠিলে যে কি দুরবস্থা হয় তাহা গৃহিণীগণ দেখিয়াও দেখেন না এই দুঃখ। আরও দুঃখ এই যে তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না, যে মোটা কাপড়ের ভার বহন করিতে করিতে উহা বহন করিবার শক্তি জন্মে, পক্ষান্তরে মিহি কাপড় পরিতে—শরীরের শক্তি শু তদনুযায়ী হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

তার পরে ধর সৌখিনতা বা বিলাসিতা, এতেও কম খরচ হয় না। ইহা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিয়া কত যে অনর্থ ঘটাইতেছে তার আর সীমা নাই। সৌখিনতায় সাধারণতঃ অলসতা আনয়ন করে এবং এই অলসতাই যত অনর্থের মূল। সুগন্ধি সাবান না হ'লে কি গাত্র পরিষ্কার করা যায় না? সুগন্ধি তৈল, এসেন্স্ ব্যবহার না করলে কি চলেনা? এই গুলিতে অনর্থক টাকা ব্যয় ক'রে, যাহা না হ'লে নয় তাহা ক্রয় করতে টাকার অভাব হইয়া পড়ে, অথচ অভ্যাস দোষটা ছাড়া যায় না, কারণ অভ্যাসটী শেষে স্বভাবে পরিণত হইয়া উঠে, এবং

"অভাবেই স্বভাব নষ্ট" হইলে কি হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি ভায়া! সমাজ হইতে এই সব দোষ দূর করিয়া দিতে চেষ্টা কর না কেন? সকলকে বুঝাইয়া বল্লে, এবং নিজকেও এই আদর্শে গঠিত করিলে, একদিন না একদিন সকলেই তোমার প্রদর্শিত পথের পথিক হইবে, এবং সমাজের সমস্ত গলদ্গুলি বিদূরীত হইয়া বিশুদ্ধ সমাজ প্রস্তুত হইবে।

বাচস্পতি—ভায়া হরিঘোষ। তুমি যা বল্লে তা করতে পার্‌লে সংসার যে সুখের হয়, কত গরীবের যে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, তবে ভায়া! একটী বিষয় আমি কর্‌তে পার্‌বো ব'লে মনে হয় না।

হরিঘোষ (সবিস্ময়ে)—ভায়া! কথাটী একেবারেই ব'লে ফেল, গোপন কর কেন? সরল না হ'লে মুক্তি হয় না জান তো?

বাচস্পতি—তুমি তো জান যে একে একে দুইটী গৃহিণী আমাকে ইহধামে রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তো আরও জান যে নিস্তারিনী আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, কাজেই বড় আদরের গৃহিণী। পাছে ইনিও আমাকে ছেড়ে লোকান্তর গমন করেন এই আশঙ্কায় আমি উহাকে বড় কিছু বলি না, পরন্তু ইনি যখন যে অভিলাষ জ্ঞাপন করেন, আমি প্রাণপণে তাহাই রক্ষা করিয়া থাকি।

স্ত্রীলোক কুড়িতে পদার্পণ করিলেই বুড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার বয়স এখন বাঁইশ হইলেও, বৃদ্ধের স্ত্রী ব'লে লোকে

ইহাকে বৃদ্ধাই বলিয়া থাকে। ইনি কিন্তু বৃদ্ধা হ'তে চান না, বরং একথা বলিলে তার বড় রাগ ধ'রে। আগেকার মত চালচলন, আগেকার মত হাব্‌ভাব্, সবই তার এখনও আগেকার মত। সুগন্ধি তৈল, এসেন্স্, সুগন্ধি সাবান, ঢাকাই মিহি সাড়ী, বডিস্, কামিজ্ ইত্যাদি সবই তিনি এখনো পূর্ব্বের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কেহ জিজ্ঞাস্ করলে বলেন, "কি করবো ভাই গোঁড়া থেকে এ অভ্যাসটা কো'রে এসেছি এখন কেমন ক'রে হঠাৎ ছেড়ে দিই। আর দেখ ভাই! স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্যও তো পোষাক পরিচ্ছদটা একটু ভাল কো'রে করতে হয়। মিন্সে কয় দিন বা বাঁচ্‌বে, তার পর তো আর ওসব ব্যবহার করতে পার্‌বো না, তাই অভ্যাসটা বরাবর বজায় রেখে আস্‌ছি।" দেখ হরি ভায়া! সমাজ সংস্কার করতে আমাকে যে যে উপদেশ দিয়েছ আমি তার সবই পার্‌বো, পার্‌বো না কেবল হাল ফ্যাসনে চলাফেরার্ স্বভাবটার সংস্কার কর্‌তে। তা ভাই তুমি এ বিষয়ে আমাকে মাপ কর। আর যা যা ব'লেছ সে সকলের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করতে আমি কোনরূপ ত্রুটী কো'র্‌ব না।

হরিঘোষ—ঠাকুর! তোমার কথা শু'নে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে নিজ পরিবারের সংস্কার সাধন করিতে পারে না, গৃহিণীর মনস্তুষ্টিরূপ সামান্য স্বার্থটুকু ত্যাগ

করিতে অসমর্থ তাঁহাদ্বারা সমাজের সংস্কার-সাধন কতদূর সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাস্পচতি—তুমি গৃহশূন্য হইয়াও ইহা বুঝিতে পারনা বড়ই আশ্চর্য্য। গৃহিণীর বস্ত্রাদির ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে গেলেই তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, অভিমানে হয়তো কয়েকদিন না খাইয়াই থাকিবেন, ব্যাপার আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে, ভয়ঙ্কর অনর্থও ঘটিতে পারে, তখনতো আমার দশা তোমার মতই হইবে, হাত পু'ড়ে ভাত খেতে হবে আর তোমারই মত ঐরূপ গান গেয়ে গেয়ে রজনী-যাপন করতে হবে। আমাকে তোমারই মত দশা প্রাপ্ত হইতে বল নাকি? উঃ কি ভয়ানক কথা?

হরিঘোষ—তা বল্‌বো কেন ভাই। বেঁচে থাকুন নিস্তারিণী ঠাক্‌রুণ যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে। তোমাদের সুখের পথে আমি কণ্টক ছড়াতে চাই না। যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু ভাই একটী অনুরোধ, একবার তাঁকে বুঝাইয়ে ব'লে দেখ, তাতে যদি একটুকুও ফল না হয় তখনতো আমাকে বল্‌তে পার্‌বে, শুধু বলা কেন, যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পার্‌বে।

বাচস্পতি—আচ্ছা ভাই! তুমি যখন নিতান্তই অনুরোধ কর, তখন একবার বো'লে ক'য়ে দেখবো।

এই বলিয়া তিনি বিরস বদনে, ধীরে ধীরে, ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, হরিঘোষ ও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাচস্পতি মহাশয়কে বিরস বদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তদীয় পত্নী নিস্তারিনী দেবী তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় তাহার গোচর করিলেন, তদুত্তরে নিস্তারিণী দেবী যাহা বলিলেন তাহাতে বাচস্পতি মহাশয় বড়ই বিস্মিত হইলেন। নিস্তারিণী যে এত শীঘ্র তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন ইহা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই :

বাচস্পতি—হাল্ ফ্যাসনে তোমার বস্ত্রাদি পরিধান সন্দর্শন করিয়া সমাজের চক্ষে ঠেকিতেছে তুমি যদি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকদের মত মোটা কাপড় ব্যবহার কর তবে অনেকটা খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং তোমারই আদর্শে গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ও তাহাদের অভ্যাসের সংস্কার সাধন করিবে। এইরূপে সমাজ হইতে ক্রমে এই কুপ্রথাটী চলিয়া যাইবে এবং সমাজের ও দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইবে।

নিস্তারিনী —এ'তো সামান্য কথা। সমাজ সংস্কারের জন্য জন্য যদি এইটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলাম তবে জীবনে ধিক্! এরই জন্য তোমার মুখখানা কালি হ'য়েছে? এতো বড় আশ্চর্য্যের কথা! তুমিই না আমাকে অনেকবার ব'লেছ যে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ না করলে সমাজের সংস্কার সাধন অসম্ভব, এখন তোমায় তার বিপরীত ভাব দেখিতেছি কেন? পতিই স্ত্রীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। আজীবন প্রাণপণে পতির আদেশ পালন

করা স্ত্রীর একমাত্র পরম ধর্ম্ম, পৃথিবীর যত ব্রত, যত তীর্থভ্রমণ ফল এসকল একত্রে তুলাদণ্ডে ওজন করিলেও স্ত্রীর পক্ষে স্বামী-সেবারূপ ফলের সমান হয় না, সমান হওয়া দূরে থাক শতাংশের একাংশও হইতে পারে না। তোমা হেন পতি রত্ন পাইয়া তোমারই আদেশ ও উপদেশ যদি পালন করিতে না পারি তবে নরকেও তো আমার স্থান হবে না। আমি না বুঝিয়া অনেক সময় তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, শেষে তোমার উপদেশে নিজে ক্রটী বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। সতত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি জন্ম-জন্মান্তরে ও যেন তোমা হেন স্বামীরত্ন লাভ করি। "এখন যাও, ঘোষ মহাশয়কে বল গিয়ে, তার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে আমার কোনরূপ আপত্তিই নাই"।

যথা সময়ে নিস্তারিণীর মত পরিবর্ত্তনের বিষয় ঘোষ মহাশয়ের কর্ণ গোচর হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, সমাজের নেতৃবর্গ ও অপর সাধারণ লোকেরাও সমাজ সংস্কার বিষয়ক সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন, গ্রহণ করিলেন না কেবল ঘোষ পরিবারকে সমাজে পুনর্গ্রহণ প্রস্তাবটী। তাঁহারা বলিলেন "বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সমাজচ্যুত ব্যক্তিদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিলে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়"। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে "ধোপা-নাপিত পুরোহিতকে বাচস্পতি মহাশয় ঘোষ পরিবারে যে পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে

আদেশ দিয়াছেন এবিষয়ের সহিত সমাজের কোন সংশ্রব নাই। তিনি সমাজের মত না নিয়া যখন একার্য্য করিয়াছেন তখন তিনি নিজেই এজন্য দায়ী, সমাজ কোনরূপ দায়ী নহেন"।

ক্রমে এই সংবাদ ধোপা-নাপিত পুরোহিতের কর্ণগোচর। তাহারা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিশেষ বিপন্ন হইবে মনে করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে নিরস্ত হইল, ফলে ঘোষ পরিবার "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" অর্থাৎ এক ঘ'রে হইয়াই রহিল। সমাজ যাহাদের বিপক্ষে তাহাদের যেমন দশা হয় ঘোষাপরিবারেরও তেমন দশা হইল ইহা বলাই বাহুল্য।
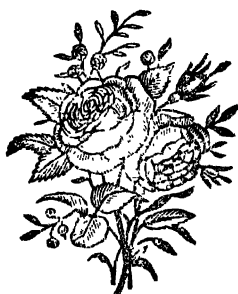
নবম অধ্যায়।

আজ ভাদ্র মাসের মাত্র দুই দিন, শারদীয়া পূজার এখনও মাসাধিককাল বাকি কিন্তু ইতি মধ্যেই চারিদিকে পূজার সাঁড়া পড়িয়া গিয়াছে, কে কত টাকা এতদুপলক্ষে খরচ করিবেন, কি কি জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে হইবে; কাহাকে কি দিতে হইবে এখন থেকেই তাহার ফর্দ্দ করিতেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বন্ধের প্রতীক্ষায় আপনাপন পাঠে আর তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না, প্রত্যেকেই দিন গণিতেছে। মাতা বিদেশ গত ছেলের জন্য, যুবতী স্বামী মুখ দর্শন-প্রতীক্ষায় অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা "বাবা কবে আস্‌বেন, বাবা কবে আসবেন বলিয়া মাকে, পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতেছে, মা তাহাদের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া কখনো বা বলিতেছেন "তিনি এবার বাড়ী আসিবেন না এবং তোদের জন্য কিছুই আনিবেন না। এই কথা শুনিয়া তাহারা দুই চারিটা কিল, চাপড় মাকে বেশ করিয়া উপহার দিতেছে তবু তা'রা আসল কথা বুঝিতে না পারিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া কেবলই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। মা তখন তাহাদিগকে একে একে কোলে টানিয়া লইয়া অঞ্চল দ্বারা সস্নেহে চক্ষু ও গণ্ডস্থল মুছাইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করতঃ আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন "তিনি শীঘ্রই আসিবেন", আর তা'রাও শান্ত হইয়া ছুটো ছুটি লাফালাফি করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে।

পূজার দিনের প্রতীক্ষায়, আত্মীয়-স্বজনের মুখ কমল দর্শনাশায় প্রত্যেকেই অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে, দিন তাড়াতাড়ি ফুরায় না দেখিয়া কেহ কেহ বা দিনের উপর অযথা গালি বর্ষণ করিতেছে, তবুতো পোড়া দিন ফুরায় না বাফুরাইতে জানে না!

চাকুরীর খাতিরে বিদেশগত স্বামীর মুখ দর্শন-আশায় নব বিবাহিত যুবতীদের মনেই এই ভাবটী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইতেছে। কোন কোন যুবতী স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন জন্য গৃহাদি ও গৃহস্থিত নানাবিধ আস্‌বাব পরিষ্কার করণ কার্য্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা সুগন্ধি সাবানাদি প্রয়োগে শরীরের বর্ণ অধিকতর ফর্সা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কেহ বা পুনঃ পুনঃ কবরী রচনা করিতেছেন, খুলিতেছেন, আবার বাঁধিতেছেন, আবার খুলিতেছেন; বার বার এইরূপ করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই মনের মত করিয়া কবরী বাঁধিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেছেন, এবং ননদেরা এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। স্বামী এবার বাড়ী আসিবেন না এই কথা হঠাৎ জানিতে পারিয়া কোন কোন যুবতীর মনোভঙ্গ হইতেছে, জোর করিয়া কোন কাজেই মন দিতে পারিতেছেন না। হাত থেকে কখনো থালাটা কখনো বা বাটীটা অনিচ্ছায় পড়িয়া যায়, অমনি উহা কুড়াইয়া লন আবার অমনি পড়ে, অহরহঃ এইরূপই হইতে লাগিল।

মাথায় তৈল দেন না, কবরী বাঁধেন না, পেট ভরিয়া খান না, রাত্রে নয়ন দ্বয়ে নিদ্রা দেবীর আবির্ভাব পর্য্যন্ত হয় না, এবম্বিধ কত কত ঘটনাও হইতে লাগিল। কাহারো পিতৃশোক, কাহাঁরো ভ্রাতৃশোক কাহাঁরো বা পতিশোক এ সময় বিশেষ ভাবে উথলিয়া উঠিল।

পূজার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই স্থল বিশেষে কাহারো আনন্দ রাশি কাহারো বা দুঃখ রাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের ভাবও স্থল বিশেষে যে বিশিষ্ট ভাবে জাগিয়া না উঠিল তাও নয়।

শ্রীযুক্ত যাদবলাল ও মাধবলাল সেন ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছোট ভাই মাধব বড় চাকুরে, মাসিক তিন শত টাকা বেতন পান, তদুপরি যথেষ্ট উপরি পাওনাও আছে। সন্তানের মধ্যে মাত্র একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। ছেলেটীর বয়স বার বৎসর, মেয়েটীর ছয় বৎসর।

স্ত্রী বামাসুন্দরীর যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। লোকের সহিত মিশিতে, মিষ্টি কথায় লোককে তুষ্ট করিতে তিনি যেমন পারেন অপরে তেমন পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেই একবার তা'কে দেখিয়াছেন, তা'র বাক্যসুধা পান করিয়াছেন সেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বৎসরে এগারো মাস স্বামীর সহিত বিদেশেই থাকেন এবং কেবল পূজার সময়েই বাড়ী যান। তা'কে দেখ্‌বার জন্য, তা'র

কথা শুন্‌বার জন্য বিকেল বেলা তা'র বাসায় যেন লোকের হাট বসিয়া যায়।

রামার মা, শ্যামার মাসী, ডিপ্‌টী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ্ বাবুর স্ত্রী এবং এমন আরো কত কত সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত পরিবার তা'র বাসায় ভ্রমণচ্ছলে গমন করিয়া তা'কে কৃতার্থ করেন এবং নিজেরাও কৃতার্থ হয়েন, কিন্তু নানারূপ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা হইলেও একটী মাত্র দোষ তা'র গুণরাশি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। যদিও তিনি পরকে খাওয়াইতে, পরের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না তবু ভাসুরঠাকুর বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কতকগুলি ছেলেপিলে নিয়া তাহার স্বামীর কঠিন পরিশ্রম লব্ধ অর্থ প্রতিমাসে শোষণ করেন এই দৃশ্য তাহার চক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

তাহার স্বামীর দৃষ্টি কিছুতেই এদিকে নিপতিত হইল না দেখিয়া তিনি আরও দুঃখিতা হইলেন। স্বামীকে কতরূপে বুঝাইলেন তবু স্বামী বুঝিলেন না বা বুঝিতে চাহিলেন না, পরন্তু বলিলেন—"যার যার ভাগ্যে সে সে খায়", ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" কিন্তু যার অভিসন্ধি দুষ্ট সে কখনো তা'র মত বিরুদ্ধ কথা বা যুক্তি প্রমাণাদি শুনিতে অথবা গ্রাহ্য করিতে চাহে না, কারণ সেইগুলি তা'র দুরভিসন্ধি সিদ্ধির পক্ষে ভয়ানক অন্তরায়, বন্যার জলে যেমন সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়, কোন কিছুই তাহার গতিরোধ

করিতে সমর্থ হয় না, সামান্য যুক্তি তর্কে দুষ্টের দুষ্টাভিসন্ধি ব্যর্থ করা তেমনি সুদূর পরাহত। সেকেলে ব্যাঘ্র ও মেষ শাবকের কথা তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। যাহা হউক, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্ত্রী—তুমি মাতৃভূমি হইতে সুদূর বিদেশে আসিয়া মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন কর, আর তোমার দাদা এতগুলি ছেলে পিলে নিয়া বাড়ী বসিয়া বিনা পরিশ্রমে তোমারই পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ-শোষণ করে ইহাকি তুমি দেখিয়াও দেখনা ?

স্বামী—দেখিব কি ? তাঁহাকে তো জমি জমা বাড়ী ঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বাড়ীতে রাখা হইয়াছে, এগুলি কি কাজ নয় ?

স্ত্রী—কাজই বটে। তবে কিনা উনি যে পরিমাণ কাজ করেন, তদনুরূপ একটা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া উহাঁকে দিলেইতো সব গোল চুকিয়া যায়। আর বিশেষতঃ, তাঁর ছেলেপিলেদের দ্বারা তো সংসারের কোন উপকারই সাধিত হয় না। তবে তাদের জন্য অনর্থক অর্থব্যয় করা হয় কেন ? এইরূপ অর্থব্যয় আর অলসতার প্রশ্রয় প্রদান একই কথা নয় কি ?

স্বামী—বড় ভাই পিতৃ তুল্য মাননীয়। ছোট বেলায় তাঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়েই আমি শিক্ষালাভ করিয়া আজ এত টাকা উপার্জ্জন করিতেছি এবং তাঁহারই করুণায় তোমাহেন নারীরত্ন

লাভে সমর্থ হইয়াছি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার সন্তোষ-বিধান করা আমাদের উভয়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য, যাবজ্জীবন তাঁহাকে প্রতিপালন করা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমাকে উচিত নয় কি ?

স্ত্রী—আমি তোমার একথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। তাঁহাকে মান্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বটে। উনি জমি জমা গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া উঁহার সকলকেই যাবজ্জাবন প্রতিপালন করিতে হইবে এইরূপ বাধ্যবাধকতা আমাদের থাকিতে পারেনা, আর বিশেষতঃ অলসতার. প্রশ্রয় প্রদান করাও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া আমার মনে হয় না। আর একটা কথা এই যে উনি বরাবরই বাড়ীতে থাকেন, আর আমরা বিদেশবাসী, জমিজমার খাজনাপত্র যাহা হয় উনিই আদায় করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন, কোথায় কোন্ তালুক আছে তাও তুমি জাননা, প্রজারাও তাঁহাকেই চিনে, তোমাকে চিনে না। এরূপ ক্ষেত্রে তোমাকে বেদখল দিয়া সমস্ত জমি জমা ভোগ করা তাঁহার পক্ষে একদিন অসম্ভব নাও হইতে পারে, অতএব এবার পূজোপলক্ষে বাড়ী গিয়া সম্পত্তি বিভাগ করিয়া ফেলাই নিতান্ত সঙ্গত মনে করি, যেন ভবিষ্যতে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত না হইতে হয়। আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এবার বাড়ী যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে ইহাই করিবে।

স্বামী—অর্থোপার্জ্জন আমি করি, ইহাতে যে পরিশ্রম হয় তাহা আমারই হয় কিন্তু তুমি কেন যে এজন্য এত মাথা ঘামাও তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

স্ত্রী—তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি, তাই এতগুলি কথা বলিলাম, এখন তোমার ইচ্ছা।

স্বামী—তোমার পেটে যে এত বুদ্ধি আছে তাহা এতদিন জানিতে পারি নাই জানিবার সুযোগও দেও নাই, জানিলে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইতে পারিতাম, যাহা হউক বাড়ী গিয়ে বিজয়া দশমীর পরদিবসই ইহার একটা ব্যবস্থা করিব।

স্ত্রী বামাসুন্দরী তদীয় স্বামীর এই কথায় বড় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, পরন্তু স্বামী তাহাকে বিদ্রূপ করিলেন ভাবিয়া মনে মনে ভারী বিরক্ত হইলেন কিন্তু কথায় কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। স্বামী কিরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা যথাসময়ে সকলেই জানিতে পারিবেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। চাকুরীর খাতিরে যাঁহারা বিদেশে ছিলেন তাঁহারা সকলেই এ সময় নিজ নিজ বাটীতে রওনা হইলেন। নৌকা বোঝাই করিয়া চাকুরের দল পাঠা, খাঁসী, তরি তরকারী ও পূজার নানাবিধ সম্ভার আনয়ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিলেন না। তাঁহাদের নৌকা বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে পাঠা খাঁসীর ভ্যাঁ ভ্যাঁ রব শুনিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেহ ঐ "বাবা আসিতেছেন", কেহ "ঐ কাকা আসিতেছেন" মনে করিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তাঁহারা বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র ছেলে মেয়েরা তাঁহাদিগকে জড়াইয়া

ধরিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল, কত দিনের হারানিধি যেন তাহারা ফিরিয়া পাইল।

এদিকে ঘোষ পরিবারের অবস্থা বর্ণনাতীত, পূজার মাত্র দুই দিন বাকী তবু কুম্ভকার আসিয়া প্রতিমা প্রস্তুত করিল না, পুরোহিত তো পূজা করিবে না বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন, পাঁচক-ব্রাহ্মণেরও অভাব হইল। পূজায় আনন্দের পরিবর্ত্তে ঘোষ পরিবারে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। রমেশ ও দীনেশ সমাজকে ধিক্কার দিয়া নানারূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং শাস্তি পূজা ভঙ্গে ভবিষ্যৎ বিপৎপাতাশঙ্কায় নিতান্ত অধীরা হইয়া হায়! হায়! করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নিরুপমা, মহামায়াও স্থির থাকিতে পারিল না, কোনও প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যুতেও বোধ হয় এরূপ কান্নার রোল উঠে না। সেই ক্রন্দনে গৃহপালিত পশুপক্ষীর চিত্ত পর্য্যন্ত বিচলিত হইল, উহাদের নয়ন-কোণ হইতে অবিরল অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল তাই বিকট শব্দ করিয়া প্রত্যেকেই যেন সমবেদনা জানাইতে লাগিল; কিন্তু হায়! নিরেট পাষাণ সমাজের চিত্ত তাহাতেও দ্রবীভূত হইল না। তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি যেন কাহারো কর্ণে পোঁছিছিল না, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে এমন একটী প্রাণীও যেন সমাজে নাই, কেহই আসিয়া দেখিল না বা জিজ্ঞাসা করিল না তাহারা কেন এত কান্নাকাটি করিতেছে, সান্ত্বনা প্রদান করা তো দূরের কথা। সেই দিন ঘোষ পরিবারের

এমন কি উনানটী পর্য্যন্ত জ্বলিল না, সকলেই একেবারে অনাহারে কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃক্‌পাত নাই। রাত্রিতে কেহ জলগ্রহণও করিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা যেন তাহাদের তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, অবশেষ শারদিয়া চন্দ্রমার স্নিগ্ধকিরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শোকভার কিঞ্চিৎ প্রশমনের পর তাহারা বিপন্নের সহায় একমাত্র ভগবানে সমস্ত নির্ভর করিয়া আপনাপন শয্যায় পড়িয়া রহিল। রজনীর নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ঝিল্লীরব তান ধরিতে আরম্ভ করিল, আর পেঁচকগণ সময় সময় তাহাতে সারা দিতে লাগিল।

কিন্তু শান্তি? শান্তি কাতর স্বরে জগন্মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"মা, আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে তোমার পূজা করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইলাম। সকলেই তোমার সন্তান, আমরা কি সেই সকলের মধ্যে কেহ নই? সকলেই তোমার পূজা করিতে পারিবে, আমরা কেন পারিব না মা? তোমার কাছে তো সকলেই সমান, সকলকেই তুমি সমান দেখ, সমান ভালবাস, তবে আমরা এত ক্লেশ ভোগ করিতেছি কেন? তুমি কি আমাদের ক্লেশ দেখ না? আমাদের ক্রন্দন শুন না অথবা আমাদের ক্রন্দনধ্বনি কি তোমার কর্ণকূহরে পৌঁছে না? মা! তুমিও কি আমাদের সমাজের মত বধির হইলে? তোমার হৃদয়ও কি সেইরূপ পাষাণে গঠিত? জগদম্বে! ঘোষ-পরিবার আজ সমাজে বিপন্ন বলিয়া কি তোমারও পূজা

গ্রহণের ইচ্ছা নাই মা ? আকুলচিত্তে শান্তি ভগবতীর উদ্দেশে এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এসময় নিদ্রাদেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, অতি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া শান্তিকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। সে কখন নিদ্রাভিভূত হইল বাটীর মধ্যে কেহ জানিতেও পারিল না। যখন কেহ শোকে দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে তখন নিদ্রা দেবীই তাহার সহায় হন, তা না হ'লে দুর্ব্বহ শোক দুঃখভার বহন করা সাধ্যাতীত হইত, বাঁচিয়া থাকাও কঠিন হইত। দুস্থ ও পথশ্রান্ত ব্যক্তিদের উপরই ইঁহার অপার করুণা। ভোগ-সুখে রত ধনীর অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ইঁহার সমধিক গতিবিধি। ইঁহার করুণায় রোগক্লিষ্টের রোগ যাতনা, পরিশ্রান্ত পথিকের পথশ্রম, দরিদ্রের দুঃখভার কিয়ৎকালের জন্য তিরোহিত হয়।

শান্তির পক্ষেও তাহাই হইল। সে কখন নিদ্রিত হইল এবং কতক্ষণ নিদ্রিত ছিল বুঝিতেও পারিল না ; কিন্তু অকস্মাৎ একটী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া শান্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল। শান্তি "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার চীৎকারে আর আর সকলেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুগন্ধি ধূপ ও পুষ্পগন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। রমেশ প্রভৃতি সকলেই শান্তির চীৎকারের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে শান্তি তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। শান্তি বলিল "দশভূজা মা ভগবতী যেন আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন।

"মা আমি তোদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোদের পূজা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কার কোন কারণই নাই। যে যেরূপ ভাবে আমাকে ডাকে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হই, ভক্তিপূর্ব্বক যে যাহা দেয় আমি তাহাই গ্রহণ করি। আমার নিকট ছোটবড়, ধনী, নির্ধন ভেদ নাই, কারণ সকলেই আমার সন্তান। আমার নিকট জাতিভেদ, বর্ণভেদ নাই। প্রতিমা প্রস্তুত হইল না, পাঁচক-ব্রাহ্মণ মিলিল না, পুরোহিত ও আসিবে না মনে করিয়া পূজা ভঙ্গের আশঙ্কায় তোমরা মর্ম্মাহত হইয়াছ, কিন্তু জানিও ইহাতে তোমাদের দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। পুরোহিত তোমাদের প্রতিনিধি মাত্র। কায়মনোবাক্যে যে কেহ আমার আরাধনা করিলেই আমি সন্তুষ্ট হই। যাহারা এইরূপ ভাবে আমার আরাধনা করিতে পারে তাহাদের পক্ষে পুরোহিতের কোনই দরকার নাই। তোমরা যেরূপ একাগ্রচিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছ, আমাকে ডাকিয়াছ, সেইরূপ ভাবেই আমার আরাধনা করিও, আমাকে ডাকিও। মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করা একটী লোকাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি সকলের মধ্যেই আছি, অতএব মানসক্ষেত্রে আমার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমি সকলের

রন্ধন সামগ্রীই ভক্ষণ করি কারণ জাতি কিম্বা বর্ণভেদ আমার কাছে নাই, অতএব পাঁচক-ব্রাহ্মণের কোন দরকার নাই। তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক যাহাই রন্ধন করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে আমি সাদরে তাহাই গ্রহণ করিব। পূজায় বাদ্য-ভাণ্ড না হইলেও চলিবে। আসল কথা হচ্চে ভক্তি এবং ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তিবিহীন পূজা এবং বাদ্য-ভাণ্ডাদির আরম্বর লোক দেখান মাত্র। যাও, পূজার আয়োজনপত্র যাহা পার করগে, এখন আমি আসি"।

এই বলিয়া মা ভগবতী আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, যতদূর চক্ষু গেল তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কি যেন বলিতে চাহিলাম বলিতে পারিলাম না। তিনি যেই অদৃশ্য হইলেন অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, অতঃপর যাহা যাহা হইয়াছে তাহা তোমরা সকলেই জান।"

এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রজনীর অবশিষ্টাংশ তাহারা সকলেই মা'র অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কাঁটাইয়া দিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলেই প্রাতঃস্নানান্তে মা'কে প্রাণভরিয়া ডাকিয়া লইল, এক মা শব্দ উচ্চারণ তাহাদের এতকালের অশান্তি যেন নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হইল। নব বলে, নব উৎসাহে, অপূর্ব্ব শান্তিতে তাহাদের হৃদয় পরিপূরীত হইল, যেন আবার নূতন জন্ম হইল বলিয়া তাহারা মনে করিল।

কি রোগ যন্ত্রণায়, কি আকস্মিক বিপৎপাতে যখন আমরা মা, মা বলিয়া প্রাণভরে ডাকি তখন যেন অপূর্ব্ব শান্তি পাই, ভয়ের কণা মাত্রও তখন আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। মা শব্দের এমন গুণ না থাকিলে কি এত আদর হইত ? মা অবাধ্য সন্তানকে প্রহার করিলেও সন্তান যখন মা ! মা ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে, ভূমিতে গড়াগড়ি যায়, তখন মা কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন ? কখনই নয়। মা তখন রোরুদ্যমান সন্তানকে সাদরে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে থাকেন, কতরূপ কথা বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দেন। এমন মা'কে যাহারা ভক্তি না করে, ধিক্ তাহাদের অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারনে। আহা যা'দের মা নাই তাদের কত দুঃখ ! মার করুণা, স্নেহ, মমতা সন্দর্শন করিয়াই জগন্মাতার করুণা, স্নেহ, মমতা কত তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি, এবং ইতিপূর্ব্বেও সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মাতৃহীনা পিতৃহীনা, সমাজচ্যুতা শান্তি ঘোর বিপদে পতিতা হইয়া কনিষ্ঠ ভাই রমেশ ও দীনেশের সহিত যখন একাগ্রচিত্তে জগন্মাতাকে কাতর স্বরে ডাকিয়া ছিল তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন পাঠক পাঠিকা অবগত আছেন। "ভক্তাধীন ভগবান" ইহা শাস্ত্র-বাক্য ; প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতির কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। শুধু মা ! মা ! বাবা ! বাবা ! করিয়া ডাকিলেই হয় না,

ডাকার মত ডাকা চাই, মনে প্রাণে ডাকা চাই, তা না হ'লে তা'র দর্শন মিলে না, মিলিতে পারে না।

শান্তি জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া নব উৎসাহে নব উদ্যমে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা সংগ্রহ করতঃ লোকাচার অনুযায়ী, মনের মত করিয়া খুব ছোট একখানা দেবী প্রতিমা প্রস্তুত করিল। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর, সিংহ, এবং সর্ব্বোপরি মহাদেবের একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে ও ভুলিল না। গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর বড়ই সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করিল। ছিন্নমুণ্ড মহিষের প্রতিকৃতি এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভীমদরশন অসুরের চেহারাটী বড়ই মানান সই হইল।

পূজার দিনের কথা বর্ণনাতীত। প্রাতঃস্নানান্তে নিরুপমা ও মহামায়া দেবীর ভোগের জন্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করণে মহোল্লাসে নিযুক্ত হইল, বলা বাহুল্য দেবীর অনুগ্রহে যথা সময়ের অতি পূর্ব্বেই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া প্রতিমার সম্মুখে নীত হইল। দীনেশ পুষ্প বিল্বপত্রাদি চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দেবীর সম্মুখে যথা স্থানে সংস্থাপিত করিল। পূজার আর সমস্ত আয়োজন যথারীতি ঠিক হইলে পর শান্তি, রমেশ, ও দীনেশ একাগ্রচিত্তে দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি সহকারে পূজারম্ভ হইল।

সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে মনে করিয়া যাহারা ঘোষেদের বাড়ী ভ্রমে ও পদার্পণ করিত না এমন কতিপয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি

পুরোহিত পাঁচক ও বাদ্যকর বিনা কিরূপে পূজা হইতেছে ইহা জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় গমন করিল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যেই তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়াছে অমনি এক অশ্রুত পূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইয়া স্ব স্ব শ্রবনেন্দ্রীয়ের ভ্রম প্রমাদ মনে করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। তন্মুর্হ্তেই আবার এক অপূর্ব্ব সুঘ্রান নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া ফেলিল। এমন সুমধুর বাদ্যধ্বনি, এমন পবিত্র সুগন্ধ কোথা হ'তে আসে? সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট, নিশ্চল, নিস্পন্দ অবস্থায় যেন চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। একে একে সকলেই শ্রবন ও ঘ্রান ইন্দ্রিয়ের পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা করিয়া নিঃসন্দেহে স্থির করিল যে এই মনমুগ্ধকর বাদ্যধ্বনি ও সৌরভ ঘোষেদের বাড়ী হইতে আসিতেছে। তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সুপ্ত কি জাগ্রত দ্বিধা বোধ করিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু যতই তাহারা ঘোষবাড়ীর নিকটস্থ হইতে লাগিল ততই তাহাদের ভ্রম দূর হইতে লাগিল অবশেষে তথায় উপনীত হইয়া যাহা দেখিল তাহা ভাবনার অতীত, কল্পনার ও অতীত। বাদ্য ভাণ্ডের নাম গন্ধ ও নাই অথচ তথায় যেন কত বাদ্য বাজিয়া উঠিতেছে, পুরোহিত নাই অথচ চণ্ডীমণ্ডপে কে যেন সুস্পষ্ট ভাবে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন ইহা দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল।

নিজেদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত

হইল। পুরোহিত অভাবে শান্তিকে দেবীর আরাধনা করিতে দেখিয়া তাহারা ও নতজানু হইয়া দেবীর নিকট আরাধনা করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য দেবীর নিকট নানারূপ মানস করিতে ও ক্ষান্ত হইল না।

শান্তি তদ্‌গত চিত্তে "দেবীর স্তব" পড়িতেছেন।

"তুমি মা জগন্মাতা, তুমি সারাৎসার।
তুমি বিনে ত্রিভুবনে নাহি কিছু আর॥
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমিই আকাশ,
চন্দ্র সূর্য্য জীব-জন্তু তোমারই প্রকাশ।
তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমিই সকল,
তুমি বৃক্ষ, তুমি গুল্ম, তুমি লতা, ফল।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি ভগ্নী, ভাই,
তুমি ঘটে, তুমি পটে, তুমি সর্ব্ব ঠাঁই।
তুমি ভুক্তি, তুমি মুক্তি, অনাথ-শরণ,
তুমি দিন, তুমি রাত, ঋতুর কারণ।
শরণ লইনু মাগো! তব রাঙ্গা পদে,
রাখিও মোদেরে কোলে সম্পদে বিপদে।
কখনো ভুলিনা যেন তোমার চরণ,
বিপথেতে মন যেন করে না গমন।
শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে সকল সময়,
তোমার মূরতি যেন হৃদিপটে রয়।
অন্তিমে আশ্রয় দিও চরণে তোমার
এই ভিক্ষা মাগে শান্তি, নাহি মাগি আর।"

ঘোষবাড়ীর এই অপূর্ব্ব দুর্গোৎসবের বিষয় মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামময় ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দুর্গোৎসব দেখিবার জন্য লোকেরা দলে দলে ঘোষবাড়ীতে আসিতে লাগিল। এখানে বিশেষ ভাবে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে ইহা এক বাক্যে দর্শকগণ স্বীকার করিল, শান্তির অসীম দেবী-ভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা পুলকিত হইল ও মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রতি বৎসরই ঘোষ-বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, প্রতিবৎসরই আমোদ প্রমোদ হয় কিন্তু এবার নানা বাঁধা বিপত্তির মধ্যে ও যে ভাবে দেবীর পূজা সুসম্পন্ন হইতেছে, তাহা দেবীরই একমাত্র কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয় এই কথা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল। সংস্কৃত বচন না আওরাইলেও দেবী-পূজা হয় গ্রাম্য লোকেরা এই প্রথম দেখিল, এবং ভক্তিতেই দেবগণ তুষ্ট হ'ন ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আপনাপন মনের ভ্রম দূর করিল।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই তিন দিবসই ঘোষবাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, সামাজিক বিদ্বেষবহ্নি যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কাহা'রো মনে এখন আর সে ভাব নাই, বরং বিপরিতভাব যেন প্রত্যেকের মনেই জাগরুক হইতেছে। যে সামাজিক বিদ্বেষ—বহ্নিতে এতদিন তাহারা ঘোষপরিবারকে জ্বালাতন করিয়াছে সেই বহ্নিতেই তাহারা এখন মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য প্রত্যেকেই অনুতপ্ত, দুঃখিত। যেই ন্যায়

বাচস্পতি মহাশয় অকুতোভয়ে রমেশাদির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অবশেষে সস্ত্রীক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন কিন্তু সমাজের নেতাদের ভয়ে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজ্ তিনিই ঘোষ বাড়ীর পূজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার আশা এত দিনে ফলবতী হইবে ভাবিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

কাল বিজয়া দশমী। দেবী এক বৎসরের জন্য সন্তানগণের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া সকলেই বিমর্ষ, ব্যথিত; দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া তাকাইলে মায়ের ছল ছল নেত্র, মুখপদ্ম পাণ্ডুবর্ণ এবং সন্তানগণকে কাঁদাইয়া চলিতেছেন তাই বুঝি মায়ের মলিন মুখ মলিনতর দেখাইতেছে। নবমী অন্তে সকলের মনেই যেন একটা বিষাদ ভাবপূর্ণ বিষণ্নতা নিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। আর শান্তি করজোরে বলিতেছে—"মা! তুমি চলিয়া গেলে আমি যে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে পারিব না, তুমি আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার জন্যই আমার ভ্রাতৃদ্বয় সমাজে একঘ'রে হইয়া যৎপরোনাস্তি মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছে, আমিই তা'দের ঈদৃশ দুঃখের একমাত্র কারণ। আমি সরিয়া পড়িলে

সব মিটিবে, তা'রাও ক্রমে বিষাদ-সমুদ্রে কূল পাইবে। মা! লাঞ্ছিত সন্তানগণের দুঃখ দূর কর, অভাগিনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।" শান্তি এই বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মণ্ডপে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া রমেশ ও দীনেশ দৌঁড়িয়া আসিল, তাহাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিরুপমা ও মহামায়া ছুটিয়া আসিয়া শান্তির অবস্থা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত; একে একে শান্তিকে কত প্রবোধ ও সাহস দিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল, আর ঘোষ পরিবারে যেন বিজয়া দশমীর বিষাদ-কালিমা সর্ব্বাগ্রে দেখা দিল।

যথাসময়ে দু'ভাই মায়ের প্রতিমাখানা বিসর্জ্জন দিয়া দেশ-পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর আলিঙ্গন ও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া দর বিগলিতনেত্রে গৃহে ফিরিলেন। ভ্রাতাদ্বয় প্রথমেই চণ্ডীমণ্ডপে ত্রস্ত প্রবেশ করিয়া দেখেন শান্তি একই অবস্থায় ভূমিতে পতিতা, আলুলায়িত কেশা, ধুলাবলুণ্ঠিতা। চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে; নিরুপমা ও মহামায়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। সহোদর প্রতীম রমেশ ও দীনেশ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া হাটুর উপর মাথা রাখিয়া অধোমুখে কত কি ভাবিতেছে। হায়! আজ তাহাদের ব্যথার ব্যথী কেহ নাই। তাহারা সমাজ চ্যুত সুতরাং অসহায়।

অকস্মাৎ মণ্ডপ প্রাঙ্গনে ত্রিশূল হস্তে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া নিরুপমা ভীতা ও সন্ত্রস্তা, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"একি এঁ্যা ?"

সেই শব্দ শুনিবামাত্র জলদগম্ভীর শব্দে সন্ন্যাসী ডাকিলেন "শান্তি, শান্তি, মা-উঠ্, তো'র সংসারজীবন শেষ হ'য়েছে, আর কত চাই, এখন ছেড়ে দে।" সন্ন্যাসীর পবিত্র সুগঠন, জ্যোতির্ম্ময় নয়নদ্বয় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যেন স্বয়ং মহাদেব সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া শান্তনা দিতে উপস্থিত। তখন শান্তির মনে যুগপৎ মায়ের করুণার কথা স্মরণ পড়িল, তাই অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী শান্তিকে ধরিয়া উঠাইলেন, পরে যথাক্রমে রমেশ, দীনেশ, নিরূপমা ও মহামায়া সন্ন্যাসীর পদধুলী গ্রহণ করিল।

ভক্তির টান্, ভক্তের ডাক্, মা কি স্থির থাকিতে পারেন ? তাই বুঝি মায়ের ইচ্ছায় এই মহাপুরুষের আবির্ভাব। ভক্তের পক্ষে অসম্ভব ও সম্ভব হয় বটে।

সন্ন্যাসী উপস্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎসগণ ! আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছি, মা জগদম্বা ভক্তিমতী শান্তিদ্বারা কোন এক মহতী কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন, তাই তাঁহারই ইচ্ছা ও প্রেরণায় আমি উপস্থিত। তাঁহারই কৃপায় হয়ত বিশুদ্ধচরিত্রা শান্তি পিতৃকুল শ্বশুরকুল এমন কি মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থা হইবে। শান্তির

অন্তর্ধ্যানে তোমরা বিচলিত হইও না, ভাগ্যে থাকিলে ক্ষমাশীলা শান্তি তোমাদিগকে আবার দেখা দিবে। তবে এখন এসো মা" এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন শান্তিও চক্ষের পলকটী পর্য্যন্ত না ফেলিয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল। তখন ঘোষপরিবারের কাহা'রো কথাটী পর্য্যন্ত বলিবার শক্তি নাই তাহাদের যেন চলৎশক্তি রহিত। কিয়ৎক্ষণ পর রমেশ ও দীনেশ কাতরপ্রাণে শান্তিকে ছাড়িয়া ঘড়ে ফিড়িল।

নিরুপমা ও মহামায়া দু'টী জাল্, যেন অকৃত্রিম স্নেহের পুতুলি দু'টী সহোদরা, অথবা একবৃন্তে দু'টী ফুল। তাহাদের পরস্পর স্নেহবন্ধন ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া এমনকি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিও তাৎপর্য্য না করিয়া পারে না। সুতরাং অতিত দুর্গতির কথা ভুলিয়া গিয়া আপনাপন কার্জকর্ম্মে মনোযোগ দিতে রমেশ ও দীনেশের বেশীদিন লাগিল না।

বিধির বিধান অপরিহার্য্য তাই ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত ন্যায় বাচস্পতি মহাশয় গৃহশূন্য হইলেন। হঠাৎ তদীয় পত্নী নিস্তারিনী দেবী সন্ন্যাস্ রোগে মারা গিয়াছেন। "শান্তির অদ্ভুত অন্তর্ধ্যান" ও "নিস্তারিনীর আকস্মিক মৃত্যু", ইহা নিয়া গ্রামে নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। কেহ বলেন "দৈবশক্তি", আবার কেহ বলেন "ভুঁতুরে কাণ্ড" ; অবশেষে ঘোষবাড়ীর দেবীপূজার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া শেষোক্ত অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই স্থির হইল সত্য, কিন্তু ঈদৃশী অস্বাভাবিক ঘটনা রাত্রিতে মঠ্‌বাড়ীর

বটগাছতলায় ঘটিলে প্রত্যক্ষবাদীদের শনৈঃ শনৈঃ "রাম রাম" উচ্চারণে নিকটবর্ত্তী বাড়ীর রামামালী তাঁড়া পাইয়া দৌড়িয়া পড়িত কি মরিত, বিষম সমস্যার বিষয় ছিল।

এ হেন বৃদ্ধ, পতিগুরুকে সুস্থ সবল রাখিয়া, এমনকি শেষ কথাটী পর্য্যন্ত না বলিয়া, শাঁখাসিন্দুর কপালে নিয়া নিস্তারিনীদেবী পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের পথানুসরণ করিয়াছেন, ইহা নিস্তারিনীর সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন। লোকে কথায় বলে "লক্ষ্মীছাড়া গোবিন্দ"। স্ত্রীবিয়োগ-বিধুর আমাদের সমাজের অগ্রণীপূজ্যপাদ বাচস্পতি মহাশয়ও বিশ্চিকদংশনবৎ অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, তিনি গৃহে থাকিয়াও সবদিক্‌ শূন্য দেখিতেছেন। তাই বুঝি কবি বলিয়াছেন—

"কি যাতনা বিশে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশী-বিষে দংশেনি যা'রে ?"

দশম অধ্যায়।

"নগেন! বেলা যে প্রায় সাতটা হ'তে চল্‌লো, এখনো উঠ্‌বেনা নাকি? সেন বাড়ীর মাধব বাবুর স্ত্রী বামা সুন্দরী এসে ফিরে গেলেন তবু তোমার নিদ্রাভঙ্গ হ'লো না, উনি কি মনে কোর্‌বেন? এত ঘুমুলে কি আর চলে?" বোস্‌-পাড়ার নিধু তার স্বামী নগেন্দ্রনাথ বসুকে এই বলিয়া আবার কাজে প্রবৃত্তা হ'লেন। নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—উঃ, তাইতো, বেলা যে অনেক হ'য়ে গিয়েছে!

নিধু। বেলা তো আর কা'রো চাকর নয়, সে আপন মনে চল্‌তে থাকে, কা'রো জন্য মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে না। সে যা হো'ক, মাধব বাবুর বাড়ী তোমার এখন না গেলেই নয়, অন্ততঃ তাঁর সম্মান-রক্ষার্থেও একবার সেখানে যাওয়া উচিত।

নগেন্দ্র। কেন, এমন কি ব্যাপার হ'য়েছে যে, এখন সেখানে না গেলেই নয়?

নিধু। সে অনেক কথা। এক মিনিটে ধাঁ ক'রে সব বুঝান মুস্কিল। সেখানে গেলেই সব বুঝ্‌তে পাবে, আর বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর পর গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গেই একবার দেখা সাক্ষাৎ করা উচিত। বহুকাল হ'তে এই প্রথাটা চ'লে আস্‌ছে, এ'টা কখনো ভঙ্গ করা উচিত নয়।

নগেন্দ্র। আচ্ছা, তাই হবে, তুমি ভেবোনা।

স্বামী-স্ত্রীতে যখন এইভাবে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল তখন বোস্-পাড়ার কার্ত্তিক বোসের স্ত্রী বৃদ্ধা হরসুন্দরী সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন—কিলো নিধু! স্বামী-স্ত্রীতে তো বেশ নাম ধ'রে ডাকাডাকি হচ্চিলো। তোরা কি একেবারে কাল্‌টা উল্‌টিয়ে দিলি নাকি ?

নিধু। ওঁকে নাম ধ'রে ডাকায় দোষ কি দিদি মা ? আমরা তো বরাবরই নাম ধ'রে ডাকাডাকি করি, কেউতো ইহাতে কোন দোষ ধরে না। আজ কাল তো এই নিয়মটাই বেশ চল্‌ছে। নব্য নব্যাদের মধ্যেই ইহার বেশ কাটতি দেখা যায়। পুরাণো আমলের তোমরা নূতন কিছুর প্রবর্ত্তন দেখ্‌লেই ঘৃণায় ফাঁপড় হও, রেগে অন্ধপ্রায় হ'য়ে উঠ। বরাবার সবই কি পুরাতন থাক্‌বে, নূতন কিছুই হবে না ? আর ধর, এক রকম জিনিষ, এক রকম রং দেখ্‌লে যেমন নয়নের তৃপ্তি-সাধন হয় না, এক রকম প্রথাও একইভাবে বরাবর থাক্‌লে মনের ভিতর যেন কেমন কেমন লাগে। একরূপ খাদ্য রোজ রোজ খেলে যেমন অজীর্ণ রোগ জন্মে, একই প্রথা বরাবর থাক্‌লে মনেরও তেমনি অবস্থা জন্মে, মন তখন নূতন একটা কিছুর জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। পরমেশ্বর যে নানারূপ পদার্থের সৃজন কো'রেছেন তা'র মূলেও এই সত্যতা বিশিষ্টরূপে নিহত আছে, সত্য নয় কি দিদি মা ?

হরসুন্দরী। তুই দেখ্‌ছি বড় দার্শনিক হ'য়ে উঠছিস্, কিন্তু জানিস্ সকল ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না, খাটিতেও পারে না।

নিধু। সকল ক্ষেত্রে না খাটিলেও এ ক্ষেত্রে যে খাটে তা'তে আর সন্দেহ নাই, কারণ প্রায় সকল নব্যদের মধ্যেই এই নিয়মটী বেশ খেটে উঠ্‌ছে।

হরসুন্দরী। লোকের মধ্যে তুইটী দল, একটী নব্য, অপরটী পুরাতন। যেই প্রথা তুইটীর মধ্যেই খাটে সেইটীই উৎকৃষ্ট এবং সেইটীই গ্রহণীয়। যাহা একটীতে খাটে অন্যটীতে খাটেনা তাহা কখনও সর্ব্ববাদীসম্মত বা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। আর বিশেষতঃ দোষ গুণ বিচার না করিয়া কোনটাই গ্রহণ করা উচিত নয়, করিলে অনেক সময় ঠেক্‌তে হয়।

নিধু। স্বামীকে নাম ধ'রে ডাক্‌লে কি দোষ হয় তা'তো তুমি কিছুই বোল্লে না?

হরসুন্দরী। গুণইবা কি হয় বল দেখিনি?

নিধু। গুণ বৈকি। স্বামী আর স্ত্রী উভয়েই সমান। স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে না কি?

হরসুন্দরী। হাঁ! স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বটে। তা ব'লেই স্বামীকে নাম ধ'রে ডাক্‌তে হবে এর তো কোন মানে নাই। কেতাব কোরাণেও তো ওরূপ কোন কিছু দেখি না।

নিধু। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'লো তবে উভয়েই তো সমান হ'লো। সমান হ'লেই তো সমপ্রাণ হ'লো, আর সমপ্রাণ হ'লেই তো সখা হ'লো; কারণ পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন "সমপ্রাণঃ সখামতঃ"। তাই যদি হ'লো তবে নাম ধ'রে ডাক্‌তে দোষ কি দিদি মা!

হরসুন্দরী। দেবতা তো'র চেয়ে বড় না ছোট, না তো'র সমান বল দেখিনি।

নিধু। দেবতা কি কখনো কা'রো সমান বা ছোট হ'য়ে থাকে ? দেবতা যে সকলেরই আরাধ্য, কাজেই সকলের বড় ?

হরসুন্দরী। বেশ, বেশ, তো'র উত্তর শু'নে খুব সুখী হ'লেম্। এখন বল্ দেখি স্বামী তো'র আরাধ্য কি না।

নিধু। স্বামী আরাধ্য একশত বার। শুধু আরাধ্য নয়, স্ত্রীর মুক্তির একমাত্র উপায়।

হরসুন্দরী। বেশ, বেশ, আরো সন্তুষ্ট হ'লেম্, কিন্তু যিনি আরাধ্য তিনি কেমন কো'রে সমান হ'ন বল্ দেখিনি ?

নিধু। দিদি মা! আমাকে আর লজ্জা দিওনা। আমি আমার ভ্রম এখন বেশ বুঝ্তে পা'চ্ছি, কিন্তু তাঁকে "তুমি" ব'লে সম্বোধন কর্‌তে বোধ হয় তোমার কোনই আপত্তি নাই ?

হরসুন্দরী। মা'কে আমরা "তুমি" ব'লে সম্বোধন করি। বাপকে "তুমি" ব'লে সম্বোধন করি। যিনি মায়ের বাপ, বাপেরও বাপ, সকলেরই বাপ, তাঁ'কেও আমরা তুমি ব'লেই ক'য়ে থাকি, অতএব স্বামী-দেবতাকেও দেবতাজ্ঞানে "তুমি" বল্‌তে কোন দোষই হয় না।

নিধু। দিদি মা! তোমার উপদেশে আজ আমার একটী মহা ভ্রম দূর হ'লো। তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসে আমাকে উপদেশ দিলে আরও সন্তুষ্ট হব।

হরসুন্দরী। বটে!

নিধু। তা বই কি।

হরসুন্দরী। তুই মাঝে মাঝে বরং আমাকে মনে করিস্, তা হ'লেই আমি এসে হাজির হব। এখন তবে আসি।

নিধু। যেওনা, যেওনা দিদি মা! ঐ দেখ মিসেস্ যুদা আস্‌ছেন, ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ কোরে বরং যেও।

হরসুন্দরী। আচ্ছা তাই হবে।

এই কথা বলিতে না বলিতে মিসেস্ যুদা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে মিসেস্ যুদা গ্রামস্থ "যুদা" সাহেবের স্ত্রী মৃণালিনী যুদা, সাহেবের প্রকৃত নাম যদু গোপাল চক্রবর্ত্তী। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃতী ছাত্র। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি এখন বহরমপুরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, মাসিক এক হাজার টাকা বেতন পা'ন। ইঁহার সকলই সাহেবী। খাওয়া দাওয়া, পোষাকপরিচ্ছদ, হাবভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তা সকলই ইঁহার সাহেবী ধরণে হইয়া থাকে। ইংরেজিতেই প্রায়শঃ কথাবার্ত্তা বলেন, কেবল ঠেকা পক্ষে হিন্দি কিম্বা বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রকৃত নাম যদু গোপাল চক্রবর্ত্তী হইলেও ইনি ইঞ্জিনিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং সাহেবী ধরণে চলাফেরা করায় নামটীও সাহেবী ধরণের করিয়া লইয়াছেন। ইনি নিজ নাম "যদু" না

লিখিয়া "যুদা" বলিয়া স্বাক্ষর করেন, মাঝের "গোপাল" শব্দটী আদৌ ব্যবহার করেন না, শেষ শব্দ চক্রবর্ত্তী স্থলে "চেকারবুট্টী" লিখিয়া স্বাক্ষর শেষ করেন। তাঁহার এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে পাছে বা বাঙ্গালী বলিয়া সাহেবদের নিকট ধরা পড়েন, কিন্তু এত ক'রেও গায়ের রংটা বদলাইতে পারেন নাই, এ'টাই তাঁ'র বড় দুঃখ। তবু চেষ্টার ক্রুটী নাই, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও মুখ চোখ ব্যতীত প্রায় সমস্ত অঙ্গই বস্ত্রাবরণে আবরিত রাখেন, লজ্জায় ছট্‌ফট্‌ করেন না মাত্র। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হেতু সমাজ-শাসনের ভয়ে রামপাখীর সুস্বাদু মাংসে উদর-পূর্ত্তি না করিলেও সাহেবী দোকানের কৌটাবদ্ধ "চিকেন্‌-ব্রথ" প্রায়শঃই বেষ্ট্‌ টনিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলকারী বলিয়া উদরস্থ করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না, যেহেতু ঔষধার্থে সুরাপান ও শাস্ত্রে অব্যবস্থেয় নহে ; চিকেন্‌-ব্রথ, কারী, কাট্‌লেট্‌, চপের তো কথাই নাই, কারণ এগুলি ইংরেজি শব্দ, সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কোন শব্দই নাই। কাজেই এসকল উদরস্থ করা কখনো অশাস্ত্র বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রে যাহা নাই অথবা যাহার নিষেধ বা বিধি কোনটাই শাস্ত্রে নিবদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্র বিরুদ্ধ একথা বলা কতদূর সঙ্গত তাহা ন্যায় বাগীশ, তর্গবাগীশ মহাশয়েরাই বলিতে পারেন। আর দেখুন বিলাত প্রস্তুত যে সব খাদ্য দ্রব্য কৌটায় আবদ্ধ হইয়া এদেশে আসে তাহার সবটার লেবেলের উপরই "হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় নাই" এই কয়টী কথার ইংরেজি

অনুবাদ স্পষ্ট লিখা থাকে, কাজেই ছুঁত্তি-স্পর্শ-দোষ ইহাতে হবার যো আদপেই থাকে না, এটাও ভাবিবার বিষয় নয় কি? ভাবিবার ভারটা অন্ততঃ পাঠকপাঠিকাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

নিধু। দিদি মা! ইনি মিসেস্ যুদা ওরফে মৃণালিনী চক্রবর্ত্তী। এঁর সঙ্গে তুমি ইচ্ছামত কথাবার্ত্তা ব'লে এঁকে ও আমার কর্ত্তাকে নিয়ে শীগগির মাধব বাবুর বাড়ী যাও, সেখানে মজা দেখ্‌তে পাবে যা তুমি কখনো জীবনে দেখনি।

নিধুর অনুরোধে হরসুন্দরী মিসেস্ যুদার সহিত তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে মিসেস্ যুদা ও নগেন্দ্রনাথের সহিত সেন বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখেন যে গ্রামস্থ আরো কত গণ্যমান্য লোক সমবেত হইয়াছেন, বৃদ্ধ হরিচরণ ঘোষ ও ন্যায় বাচস্পতি মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইতে ত্রুটী করেন নাই। একটী প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে চিকের অন্তরালে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ আসীন, এবং মণ্ডপের অবশিষ্টাংশ পুরুষেরা দখল করিয়া লইয়াছেন। প্রথম দর্শনে ইহাকে নিমন্ত্রণের বাড়ী বলিয়া মনে হইল, কিন্তু নিমন্ত্রণের বাড়ী যেমন হৈ চৈ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া থাকে এখানে তেমন কিছুই নয়। হৈ চৈ শব্দের পরিবর্ত্তে নীরবতা এবং প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে বিষাদের সুস্পষ্ট রেখা এ হেন মহতী সভায় বিশিষ্টভাবে বর্ত্তমান। প্রত্যেকেই যেন অবশ্যম্ভাবী কোন কিছুর প্রতীক্ষায় ধীর অথচ ব্যাগ্রভাবে

অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হইল। কিয়ৎকাল পরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ হরিচরণ ঘোষ মহাশয় সভার উদ্দেশ্য সকলকে জানাইয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, এবং সভাস্থ জনসাধারণ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতে লাগিলেন।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ! আমি সেন-বাবুদের পক্ষ হইতে এই সভায় দণ্ডায়মান হইয়াছি। আপনারা জানেন যে ইঁহারা এদেশের প্রাচীন জমীদার। এককালে ইঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, ইঁহাদের যশঃ-সৌরভে দেশ-বিদেশ পরিব্যপ্ত হইত, কিন্তু এখন তেমন সমৃদ্ধি না থাকিলেও যশোরাশি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাদব ও মাধব বাবু উভয়েই উচ্চ-শিক্ষিত। ইঁহারা যেমন সরল ও অমায়িক, প্রজারাও তেমনি ইঁহাদের আজ্ঞাবহ। বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতে প্রজাদের আর্থিকাবস্থা অভাবনীয়রূপে শোচনীয়তা প্রাপ্ত হওয়ায় জমীদার সেন-বাবুদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লাটের খাজানা পূর্ব্ববৎই দিতে হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধব বাবু গভর্ণমেণ্টের চাকুরী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, পক্ষান্তরে যাদব বাবু বাড়ীতে থাকিয়া কোনরূপ সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেছেন। আদায় তহশীলের জন্য গ্রাম্য-যুবক শোভাস কুসুম মিত্তিরকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে নায়েব নিযুক্ত করা ও আম্মোক্তারনামা রেজিষ্টারী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমে শোভাস এ কার্য্যে বেশ কৃতিত্বই দেখাইয়াছিল; সে নিতান্ত

বিশ্বাসভাজন ভৃত্যটির মত তাহার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছিল, প্রজারাও তাহার কার্য্যে বেশ সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে কোন কিছুই স্থির ও অটল থাকিতে পারে না, শোভাসের পক্ষেও তাহাই হইল। তাহার নির্ম্মল চরিত্রে ক্রমে কীট প্রবেশ করিল। সংসর্গ-দোষে তাহার চরিত্র দূষিত হইয়া পড়িল। চরিত্র খারাপ হইলে কুবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য স্বভাবতঃ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে, কাজেই সে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রজাদের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল, কর্ষা জমি অন্যের নিকট মিরাস বন্দোবস্ত দিয়া নিজেই সেই টাকা আত্মসাৎ করিতে লাগিল। প্রজারা তাহার অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া খাজানা বন্ধ করিয়া দিল। যখন তাহার চরিত্র চরম অপকর্ষ লাভ করিল তখনই শান্তি-হরণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তার পর যাহা যাহা হইয়াছে তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কাজেই তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

শোভাসের চরিত্রের কথা সেন-বাবুদের নিকট পৌঁছিতে বিশেষবিলম্ব হইয়াছিল, কানে পৌঁছিলেও বাবুরা প্রথমতঃ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এমন বিশ্বস্ত ভৃত্য যে নিতান্ত অপদার্থে পরিণত হইতে পারে ইহা তাঁহারা ধারণায়ই আনিতে পারেন নাই। বিচারালয়ে সে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইলে তাঁহারা এ ঘটনাটি প্রথমতঃ ঈর্ষামূলক বলিয়া মনে

করিলেন, কিন্তু প্রজারা যখন তাহার নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া খাজানা বন্ধ করিয়া দিল কেবল তখনই বাবুরা তাহার চরিত্র-দোষের কথা প্রথম জানিতে পারিয়াও অনতিবিলম্বে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্র হাত করিয়া শোভাসকে নায়েবের পদ হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন।

অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইয়া পড়ে ইহা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন এবং ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। স্থির-ধী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা না খাটিলেও কোমলপ্রাণা স্ত্রীলোক ও চঞ্চলমতি পুরুষদের পক্ষে প্রায়ই খাটিতে দেখা যায়। মাধব বাবুর স্ত্রীর বুদ্ধিবিপর্য্যয়-ঘটা ইহার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। অভাবে পড়িয়াই মাধববাবু গভর্ণমেণ্টের চাকুরি স্বীকার করিয়াছেন এবং যদিও তিনি মাসিক তিন শত টাকা বেতন পা'ন তথাপি তাহাতে তাহার সমস্ত ব্যয়-সঙ্কুলান হয় না, বরং খেলার চাঁদা, কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মন-পুত্রীর বিবাহের চাঁদা ইত্যাদি আরো কত কিছু চাঁদা-বিদায়ে বেতনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে, অবশিষ্ট অর্থে নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া পড়ে। সাংসারিক এইরূপ শোচনীয়তায় মাধব বাবুর স্ত্রীর মাথা বিগ্‌ড়াইয়া গেল, তিনি ভিন্ন হওয়ার জন্য স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং মাধব বাবুও উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে এই মহতী সভায় আহ্বান করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য আপনাদের নিকট বিশেষরূপে জানাইয়া দেওয়া

গেল, এখন এবিষয়ে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত হইলেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

এইরূপে সভাপতি ঘোষ মহাশয় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলে চতুর্দ্দিকেই যেন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মহিলা-সভা হইতে কার্ত্তিক বোসের স্ত্রী, পূর্ব্ববর্ণিত বৃদ্ধা হরসুন্দরী, সভায় উপস্থিত মাধব বাবুর স্ত্রী বামাসুন্দরীকে নানারূপে বুঝাইলেন ;—ভিন্ন হইলে সম্পত্তিটী নষ্ট হইবে, সেন বংশের যশোরাশি চিরতরে বিলুপ্ত হইবে, তাহা বিশদরূপে বলিলেন এবং উপস্থিত মহিলাবর্গ হরসুন্দরীর মত বিশেষভাবে সমর্থন করিলেন। কিন্তু হায়, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মত তাহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। শত চেষ্টা করিয়াও কেহই তাহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। "প্রতিজ্ঞা অটল মম রবে চিরদিন" এই মনে করিয়া তিনি নীরব হইলেন। সমবেত ভদ্র মহিলাগণ তাহার এবম্বিধ নিস্তব্ধতায় মর্ম্মাহত হইলেন। একটা সোণার সংসার শুধু একটী স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞায় নষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া শেষ বিচারভার পুরুষ-সভার উপর অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন!

তখন জনসাধারন যাদব ও মাধব বাবুর মনোগতভাব জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা পরিষ্কাররূপে বলিয়া দিলেন যে পৃথক হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের কোন মতই নাই। তাঁহারা আরও বলিলেন যে বামাসুন্দরীকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের মতে

আনিতে না পারিয়াই এই সভা আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা এই অভিমত সভা সমক্ষে ব্যক্ত করিলে চতুর্দ্দিক হইতে "ধন্য ধন্য" শব্দে তাঁহাদের উপর যেন অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইতে লাগিল, এবং হাতা তালি শব্দে সভামণ্ডপে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দকল্লোল উঠিল। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে যতদিন বামাসুন্দরী তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন না করিবেন তৎদিন তিনি কুড়ি টাকা মাসহারা ব্যতিত আর এক কপর্দ্দকও পাইবেন না।

সভায় এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিরা বামাসুন্দরী লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন এবং অতঃপর স্বীয় ভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিয়া মহিলা সভার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথা সময়ে এই সংবাদ পুরুষ-সভায় পৌঁছিলে সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং সেনবাবুদের ঘরটা রক্ষা পাইল ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তৎপর সভায় সমাজ-সংস্কার-বিষয়িণী কথার আন্দোলনও আলোচনা হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে,—যে সকল কুপ্রথা অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদের সমাজকে হীনবল ও কলঙ্কিত করিতেছে সেগুলি সকলকেই পরিহার করিতে হইবে, যে ব্যক্তি ইহা না করিবে অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে সমাজ-চ্যত ও আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। যাহাতে সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেশের অলসতা, অপব্যয়, বিলাসিতা প্রভৃতি কুরীতিগুলি অচিরে

সমাজ হইতে অপসৃত হয় এবং সর্ব্বোপরি যাহাতে সকলেই সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও স্বাস্থ্য-সুখ ভোগে সমর্থ হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে এ সভায় তাহার বিশেষরূপ আলোচনা হইয়াছিল। শোভাস কুসুম শান্তিকে অপহরণের প্রসঙ্গও সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। নিরপরাধ ঘোষপরিবারকে সমাজ-চ্যুত করিয়া রাখা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া সভা নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পক্ষান্তরে শোভাস কুসুমের উপর সকলেরই ততোধিক বিষদৃষ্টি পড়িল, এবং যাবৎ তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটে তাবৎ তাহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে, পরন্তু ঘৃণিত স্বভাবের সমুচিত দণ্ড-স্বরূপ তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার করা ও নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

সভায় এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হইলে পর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল। সভাস্থ লোকদের সমবেত চেষ্টার ফলে সেন বাবুদের নাম-কামের এক মাত্র অবলম্বন বড় একটা সম্পত্তি ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পাইল ভাবিয়া সকলেই হর্ষ ও উৎফুল্ল হৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সভার কার্য্যে একজনই কেবল সুখী হইতে পারিল না। সে আমাদের সেই সুপরিচিত কর্ম্মচ্যুত শোভাস-কুসুম ভিন্ন আর কেহই না।

সভাভঙ্গ হইলে শোভাস কোন দলের সহিতই মিশিতে সাহস পাইল না। তাই সে তখন বিরস বদনে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে অতি ধীরে ধীরে, পা চলে কি না চলে কতকটা এই ভাবে, গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। অপর সময় হইলে গৃহে পৌঁছিতে তাহার দশ মিনিট লাগিত কি না সন্দেহ কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহার যেন প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

আজ বঙ্গে বিজয়া দশমী, সন্ধ্যা উত্তীর্ণা হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তামসী রজনী সমাগতা, গ্রাম্য পথ ঘাঁটগুলি একেবারে কর্দ্দমাক্ত মাঝে মাঝে দামিনী হাসে যাহা একটু দেখা যায়। এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া দুইটী পথিক যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ চলিতেছেন, কাঁহারো সাঁড়া শব্দ নাই। ইহাদের একটী পুরুষ অপরটী নারী। পুরুষটীর মস্তকে জটাজুট, বক্ষবিলম্বিত শ্বেত-শ্মশ্রু, পরিধানে গেরুয়া বসন, গলায় ও হস্তে রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে ত্রিপুণ্ডক। নারী নবীনা, বয়স অন্যূন ত্রিংশতি। অপরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব ও অনুপম রূপলাবন্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় কোন উচ্চ বংশীয়া ধর্ম্মপ্রাণা রমণী কোন এক মহতুদ্দেশ্যে চলিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকাদিগকে ইহাদের পরিচয় বলিয়া দিতে হইবে কি? যাঁহারা জানিতে চা'ন তাঁহাদিগকে আমরা বলিব যে সেই শান্তি ও সন্ন্যাসী-সিদ্ধেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ন'ন। ইহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘোর রজনীতে দুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন। আজ শান্তি প্রপঞ্চময় মায়ার শৃঙ্খল শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কোথায় ছুটিয়াছেন। কে জানে তাঁর পরিণতি কি, বা গন্তব্য স্থান কোথায়? এইরূপ আত্মত্যাগিনী অসহায়া রমণীই ভগবৎ প্রেমে কালে দেবী-সম্ভবা হইয়া দাঁড়ায়। শান্তি যখন পথভ্রমণে ক্রমেই অবসন্না বোধ করিলেন তখন অতি নম্রভাবে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো!

আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, তাহাতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার জীবনে কখ'নো এতদূর পথ পরিভ্রমণ করি নাই। আমি ক্রমশঃ যেন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি।

সিদ্ধেশ্বর। মা, আমি তোমাকে এমন সুন্দর স্থানে লইয়া যাইতেছি যেখানে গেলে স্বতঃই বৈরাগ্যের উদয় হয়, ছোট বড়, মান-অপমান, ভেদাভেদ, রোগ-শোক ইত্যাদির লেশমাত্র থাকেনা, যেখানে গেলে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-বালক সকলেই সমান হয়।

শান্তি। বাবা, তবে কি আপনি আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছেন ?

সিদ্ধেশ্বর। মা, তোর্ তো বেশ্ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি তুই কি কখ'নো শ্মশান দেখেছিস্ ?

শান্তি। বাবা, আমি জীবনে কখনো শ্মশান না দেখিলেও শ্মশানটা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর স্থান তাহা বেশ অবগত আছি।

সিদ্ধেশ্বর। শ্মশানটা কখ'নো ভয়ঙ্কর স্থান নহে বরং চিরশান্তির স্থান, জীবনের যত কিছু অশান্তি, দুর্ব্বীসহ যন্ত্রণা, গ্লানি সকলি সেখানে বিলুপ্ত হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব যেখানে সতত বিরাজ করেন সেই স্থান কি কখ'নো অশান্তির স্থান বা ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পারে ?

শান্তি। বাবা, আপনার কথায় বুঝা যায় যে সেই স্থানটী শ্মশান না হইলেও দেবাদিদের মহাদেব সেখানে নিয়ত বিরাজ করেন।

সিদ্ধেশ্বর। হাঁ! তিনি সেখানে বিরাজ করেন বই কি। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন কাজেই সেখানেও আছেন।

শান্তি। তবে তিনি সেখানে আছেন এই কথা বিশেষভাবে বলিবার তাৎপর্য্য কি ?

সিদ্ধেশ্বর। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে সেখানেও আছেন, কারণ সেই স্থানটী তাঁহার প্রিয় কাজেই তিনি স্থানটী বড় ভালবাসেন।

শান্তি। আচ্ছা, মহাদেব তো সেখানে আছেন বুঝিলাম, জগন্মাতা ভগবতীও কি সেখানে আছেন ?

সিদ্ধেশ্বর। মা, তোমাকে যেখানে নিয়া যাইতেছি সেইটী আমার আশ্রম, সেখানে জগন্মাতা ভগবতী শ্রীশ্রী৺ কালীরূপে বিরাজমানা।

শান্তি। আপনার সুমধুর বাক্যে আমি বড়ই সুখী হইলাম, কিন্তু বলুন দেখি সেই স্থানটী আর কতদূর ? আমার পা যে আর চলেনা।

সিদ্ধেশ্বর। অই, অই যে আমার আশ্রম দেখা যাইতেছে, উহার নাম আনন্দ বাগ। সেখানে পৌঁছিলেই পথশ্রম জনিত সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া যাইবে এবং আনন্দ-বাগ নামটীর সার্থকতা বিশেষরূপ বুঝিতে পারিবে।

শান্তি। বাবা, আপনি আমাকে কি উদ্দেশ্যে তথায় এত ক্লেশ সহ্য করিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহাতো স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন না, এখন দয়া করিয়া আমাকে বলিবেন কি ?

সিদ্ধেশ্বর। তোমাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করিব, যোগ-যাগ ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম্মক্রিয়া শিক্ষা দিব।

শান্তি। তার পর, তার পর?

সিদ্ধেশ্বর। তার পর তোমাকে দেবোত্তর যাবতীয় সম্পত্তি প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলিল—"আপনি পরলোক গমন করিলে অর্থ ও সম্পত্তি দ্বারা আমি কি করিব? যদি অর্থ ভোগের লালসাই আমার থাকিয়া গেল তবে সংসার ছাড়িয়া আপনার অনুসরণ করিলাম কেন?

সিদ্ধেশ্বর। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

শান্তি। অর্থই অনর্থের মূল। বিস্তর ধনের অধিশ্বরী হইলে আবার সংসারে মতি-গতি হইবে, কুমতি আসিয়া সুমতির স্থান অধিকার করিয়া বসিবে, তখন আমি "যেই মূষিক সেই মূষিকই" হইয়া পড়িব, ভোগ বিলাসে নিয়ত নিমজ্জিতা থাকিয়া ভগবানের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইব এবং এইরূপে নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিব।

সিদ্ধেশ্বর। তোমাকে রীতিমত সন্ন্যাস ধর্ম্মে শিক্ষিতা করিয়া এমনি করিয়া তুলিব যে অর্থলিপ্সা কিম্বা ভোগ-বিলাস-বাসনাদি তোমার কিছুই থাকিবে না বরং কুকার্য্যে ঘৃণা জন্মিবে এবং পরোপকারাদি সৎকার্য্যে মন নিয়ত রত থাকিবে।

শান্তি। আমি যেই ভয়ে ভীতা হইতেছি তাহা যদি অমূলক হয় এবং তাহার অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে আমার তাহাতে কোনই আপত্তি নাই।

সিদ্ধেশ্বর। আমি শীঘ্রই তোমার নামে একখানা "উইল পত্র" করিব এবং যাবৎ তোমার মন আমার আশানুরূপ গঠিত না হয় তাবৎ উহা তোমাকে দেওয়া হইবে না। আর বিশেষতঃ উইল পত্রে একথা স্পষ্ট লিখা থাকিবে যে, নিজের ভরণ-পোষণ জন্য বৎসামান্য অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট, এক কপর্দ্দক ও কোন লোকহিতকর কার্য্য ব্যতিত অপর কিছুতেই ব্যয়িত হইতে পারিবে না।

শান্তি। হঠাৎ যদি আপনার তিরোভাব হয় তবে আমি দুঃসহায়া রমণীর পক্ষে ঐ সব ধন সম্পত্তি নিয়া আমাকে অচিরেই বিপদাপন্ন হইতে হইবে বলিয়া আমার মনে হয়, অতএব এককালীন সমস্ত অর্থ আমার হাতে না দিয়া বিশ্বস্ত কাঁহারো নিকট গচ্ছিত রাখিলে হয় না কি?

সিদ্ধেশ্বর। কথাটা মন্দ বল নাই শান্তি, কিন্তু কাঁহার হস্তে আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের ভার দেওয়া যায় ইহা বিশেষ বিবেচনাধীন।

শান্তি। আপনি কোন্ কোন্ লোকহিকতর কার্য্যে আপনার সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি নিয়োজিত করিতে মনন করিয়াছেন তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলিলে বোধ হয় কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই

নাই, আর কাহাকেই বা দেবোত্তর এই বিপুল ধন-সম্পত্তির ভার গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করেন তাহাও দয়া করিয়া বলিবেন কি ?

সিদ্ধেশ্বর। সদাশয় রাজপুরুষগণকেই ভার গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করি। তাঁহারা ইহাদ্বারা একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, একটী কুষ্ঠাশ্রম, একটী বেদ-বিদ্যালয় ও একটী অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবেন এবং এজন্য তাঁহারা যেন ভিন্ন মত না করেন, ইহা উইলের একটী পৃথক দফায় বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা রূপে সন্নিবেশিত হইবে।

শান্তি। একটী বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা এবং দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ও সাধু-সেবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা কি উচিত মনে করেন না ?

সিদ্ধেশ্বর। বেশ! বেশ! এ সকল কার্য্য করা খুবই উচিত। ধন্য তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব!

শান্তি। তবে, আশা করি এ সকল ও আপনার উইলের অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।

সিদ্ধেশ্বর। থাকিবে বই কি ? নিশ্চয় থাকিবে।

শান্তি। বাবা, আমি বিধবা রমণী আপনার দেহত্যাগ হইলে আমি কিরূপে আশ্রমে একাকিনী থাকিব, কে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?

সিদ্ধেশ্বর। কেন? স্বয়ং বাবা ভোলানাথ ও মা কালী থাকিতে তো'র কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন লোক ত্রিভুবনে নাই; আর বিশেষতঃ বন্য পশুগুলি আশ্রমের চারিদিকে মহোল্লাসে বিচরণ করিয়া দুষ্ট লোকের হাত হইতে তো'কে রক্ষা করিবে। হয় তো এই প্রকৃতির লোকদেরই বিশেষ ভয় করিতেছিস, কিন্তু জানিস্ কালক্রমে ইহারাও এই আশ্রমের সান্নিধ্যে আসিয়া শিষ্ট হইবে এবং সমস্ত পাপ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া আপনার লোকের মত হইয়া যাইবে। ইহারা সকলেই তোকে "দেবী-মা" বলিয়া ডাকিবে এবং মায়ের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে, প্রাণান্তে ও তো'র কোন অনিষ্ট সাধন করিবে না বরং সর্ব্বদা তো'র আজ্ঞাবহ হইয়া সন্তানের মত কার্য্য করিবে।

শান্তি। আশ্রমটীর নাম 'আনন্দবাঁগ না হইয়া "সিদ্ধাশ্রম" রাখিলে কোন ক্ষতি হইত কি?

সিদ্ধেশ্বর। কোনই ক্ষতি নাই, তবে কি না উহার নাম একটু ছোট করিয়া রাখিলে বরং অধিকতর ভাল হয়।

শান্তি। ছোট করিয়া আশ্রমটীর নাম কি রাখিবেন মনে করিতেছেন?

সিদ্ধেশ্বর। কেন? "শান্তি আশ্রম"।

শান্তি। বাবা! না, না। এই আশ্রমের সঙ্গে আমার নাম জড়িত না থাকিলেই ভাল হয়।

সিদ্ধেশ্বর। কেন ভাল, বল্ দেখি?

শান্তি। আমার নামানুসারে আশ্রমের নামকরণ হইলে, আমার নামটী সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িবে এবং কালে এমন হইতে পারে যে আমার আত্মীয় স্বজন যথা,—রমেশ, দীনেশ, নিরুপমা, মহামায়া—প্রভৃতি সকলেই এখানে আসিয়া আমাকে স্ব-গ্রামে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইবে, তা হ'লে আমি যে আবার ঘোর সংসারী হইয়া পড়িব। আর বিশেষতঃ আশ্রমটার নাম আপনার নামানুসারে না হইলে আপনার নামটা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এ'টা যেন আমার কেমন মনে হয়।

সিদ্ধেশ্বর। তুই ভাল মনে না করিলেও আমি খুবই ভাল মনে করি এবং কার্য্যতঃ তাহাই করা হইবে।

শান্তি। বাবা, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; কিন্তু একটী কথা এই যে—অনাথ আশ্রমটীর নাম অন্ততঃ "সিদ্ধাশ্রম" যেন রাখা হয়, তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইব।

সিদ্ধেশ্বর। পাগ্‌লি, তুই মা দেখ্‌ছি বড় নাছোঁড়বান্দা, কোন না কোনটার সঙ্গে আমার নামটী জড়িত না করিলে যেন তো'র আর মন উঠে না। আচ্ছা মা, তা'ই হ'বে।

এই কথা বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বর আশ্রমে "আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"মা, ঐ ছ্যাখ্ আমার আশ্রম, ঐ ছ্যাখ্ বাবা ভোলানাথের মন্দির, ঐ ছ্যাখ্ মা ৺কালীর মন্দির। আয়, এখন এই বটবৃক্ষ তলে একটু বিশ্রাম করি, তৎপর এই সরোবরে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া ভোলানাথ

বাবা ও মা কালীর চরণ দর্শনে গমন করি। ইহাঁরা না জানি আমাদের জন্য কত চিন্তা করিতেছেন।"

শান্তি। ইহাঁদের আবার চিন্তা কি বাবা?

সিদ্ধেশ্বর। ইহাঁরাই জগতের মা, বাপ; জগতের আক্ষুদ্র প্রাণী ইহাঁদেরই সন্তান। মা, বাপ যদি সন্তানের জন্য চিন্তা না করেন, তবে আর করিবে কে?

শান্তি। হাঁ বাবা, আপনি ঠিক ব'লেছেন, আপনার কথায় আমার একটা মহাভ্রম দূর হইল। কিন্তু বাবা, একটী বিষয় আমাকে দয়া করিয়া বলিবেন কি?

সিদ্ধেশ্বর। বল্না পাগলি বল্, আমি তো তো'র সব কথারই উত্তর দিতেছি। এখন আবার কোন্ কথাটী তো'র জিজ্ঞাস্য বা অপরিজ্ঞাত রহিল?

শান্তি। গঙ্গারামপুর হইতে এই আশ্রম কত দূর?

সিদ্ধেশ্বর। অনুমান পঞ্চাশ ক্রোশ হইবে।

শান্তি। আমরা এতটা পথ এত শীঘ্র কিরূপে অতিক্রম করিলাম তাহা আমি ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

সিদ্ধেশ্বর। আমরা অধিকাংশ পথই দৈব শক্তিতে অতিক্রম করিয়াছি; তাহার কারণ কেহ যেন অলক্ষ্যে আমাদের অনুসরণ বা গতিবিধি ঠিক করিতে না পারে ইহা ৺বাবা মায়ের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছার প্রভাবেই নিরাপদে এত সত্বর আসিয়াছি। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন ইহা অসম্ভব।

শান্তি। হাঁ বাবা, তাইতো! বাড়ী হ'তে বে'র হ'য়ে কেমন ক'রে যে কতগুলি পথ অতিক্রম করিলাম তাহা বুঝিতেই পারি নাই।

সিদ্ধেশ্বর। তা তুই বু'ঝ্‌তে পার্‌বি যখন ভগবানের নিতান্ত অনুগ্রহ হবে, তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই নয়।

শান্তি। যা'ক সে কথা, এখন তো অনেক সময় বিশ্রাম করা হ'য়েছে, এখন স্নানাদি কর্‌লে হয় না কি?

সিদ্ধেশ্বর। আয়, আয় মা স্নান করিগে।

এই বলিয়া নিজে স্নান করিলেন, শান্তি ও স্নান করিল পরে বিধিমতে সরোবর তীরে তাহাকে দীক্ষা মন্ত্র দিয়া পুষ্প বিল্বপত্রাদি চয়ণ করতঃ ভোলানাথ ও জয়কালীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহাদের চরণে অঞ্জলী প্রদান করিলেন।

শান্তি। দেব, আমার বিশ্বাস বাবা শম্ভুনাথ ও ত্রিতাপহারিণী মা কালী উভয়েই অভাগিনীর অঞ্জলী গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, একটী পুষ্প কি বিল্বপত্র ও তাঁহাদের চরণ হইতে গঁড়াইয়া পড়ে নাই। আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে!

সিদ্ধেশ্বর। ইহা বিশেষ মঙ্গলের চিহ্নই বটে, বাবা বিশ্বনাথ, মা আনন্দময়ী, তাঁহারা কি কখ'নো সন্তানের অমঙ্গল করেন?

শান্তি। বাবা! এই আশ্রমে আসিয়া অবধি আমার হৃদয়ে এত আনন্দ হইতেছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, স্থানটী এমনি সুন্দর। কিন্তু বাবা! এখানে আর কোন লোকজন

দেখিনা কেন? বেলাতো প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কোন লোকইতো এখানে আগমন করিতেছে না, কারণ কি?

সিদ্ধেশ্বর। এখানে বেশী লোক এখন আসে না, কেবল বাবা ও মা'র আরতির সময় কতিপয় মহাপ্রাণ সাধু এখানে আসিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কয়েকজন বালক-বালিকা ও ধর্ম্মশীলা নারী নানাবিধ ফল পুষ্পের ডালি হস্তে প্রত্যহ সকালবেলা এখানে আগমন করেন।

শান্তি। স্থানটী কি মনোরম, দর্শন মাত্রই যেন ইহাকে পবিত্র তীর্থ স্থান ব'লে মনে হয়। কখন এখানে তীর্থ-দর্শনেচ্ছু লোক-সমাগম হয় তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে কৃপা হইবে কি?

সিদ্ধেশ্বর। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে একটী মেলা ব'সে এবং তীর্থ উপলক্ষে তখন দেশ দেশান্তর হইতে, হরিদ্বারের কুম্ভমেলার মত, অনেক সাধু-সমাগম হইয়া থাকে। সেই সময় এখানে এত লোক হয় যে আশ্রম ও তৎস্পার্শ্বস্থ স্থানে পা রাখিবার স্থান টুকু পর্য্যন্ত থাকে না। ভগবৎকৃপায় এতদুপলক্ষে একদিন তোমার কোন না কোন আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে ইহাও অসম্ভব নয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে। পশ্চিম নীলাকাশে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যমামার কিরণ গঙ্গারামপুরের অত্যুচ্চ প্রাচীন বৃক্ষগুলির উপর বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই বিক্ষিপ্ত স্বর্ণকিরণে উজ্জ্বলীকৃত সেন বাবুদের বাড়ীর উচ্চ পাদপশ্রেণী স্বর্ণধ্বজাবৎ মা কমলার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান বলিয়া বোধ হইতেছিল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াটুকু মিত্রিদের বাড়ীর উপর দিয়া যেন যবনিকা পতনের মত মলিন আবরণ অগ্রে বিস্তার করিয়া দিল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" শাস্ত্র বাক্য আজ প্রকৃতিদেবী যেন অক্ষরে অক্ষরে সেন বাবুদের ও মিত্রিদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিতেছেন।

শোভাস-কুসুমের হৃদয় তমসাচ্ছন্ন, গুরুতর চিন্তায় ভারাক্রান্ত; তাই আজ সে ম্লান বদনে ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। শোভাসকে তদবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাহার গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সুষমাসুন্দরী, অবশ্যম্ভাবী কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হৃদয়নাথ! কখনো'তো তোমাকে এত বিমর্ষ দেখি নাই, হঠাৎ তোমার মলিনতার কারণ কি? তোমার কোন গুরুতর অসুখ হয় নাই তো, বা তোমাকে কেহ কোনরূপ অপমান বা নির্য্যাতন করে নাই তো? চুপ্ করিয়া র'ইলে যে? যদি এ দাসীর দ্বারা তোমার দুঃখাপনোদনের

কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা হয়, এ দাসী কখনো' তাহা করিতে কুণ্ঠিতা হইবে না ; এমন কি যদি জীবন পর্য্যন্তও সমর্পণ করিতে হয় তাহাও নিশ্চয় করিবে। অতএব নাথ ! অনুমতি কর এ দাসীকে কি করিতে হইবে।"

সুষমা স্বামীর বিষাদের কারণ জানিবার জন্য যতই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, শোভাসের বিষণ্ণতা ততই বাড়িতে লাগিল। জোয়ারের জল বাঁধা পাইলে যেমন অতিরিক্ত প্রবল বেগে বহিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায় শোভাসের পক্ষেও তদ্রূপই হইল। শোভাস প্রথমতঃ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু সুষমার সরল সান্ত্বনায় তাহার মনের আবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। শোভাস আর স্থির থাকিতে পারিল না, অমনি সুষমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

শোভাসের জীবনে এই প্রথম ক্রন্দন, বিশেষতঃ স্ত্রীর ক্রোড়ে। সুষমা ইতি পূর্ব্বে লোক মুখে সকল বৃত্তান্তই শ্রবণ করিয়াছেন, কাজেই আর এবম্বিধ বাক্যালাপে স্বামীর দুর্ব্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা বাড়ান সঙ্গত মনে করিলেন না। যে শোভাস-কুসুমের অত্যাচারে ও কটু বাক্যে সুষমা নিয়ত জর্জ্জরিতা হইতেন, যে শোভাসকে নানারূপ সদুপায় অবলম্বন করিয়াও সুষমা সৎপথে আনয়ন করিতে পারেন নাই, সেই শোভাসের ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া সুষমা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টা

হইলেন ; এমন কি স্বামীর ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ক্রন্দনে শোক বা দুঃখের অনেকটা লাঘব হইয়া থাকে তাই লোকে কাঁদে, নতুবা হৃদয়স্থল শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে জীবন ধারণ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিত।

বহুক্ষণ ক্রন্দনে অতিবাহিত হওয়ার পর, শোভাস-কুসুম সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুষমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুষমে! আমি মহাপাপী, আমার মত পাপী বোধ হয় আর ইহসংসারে নাই। কুলোকের সহবাসে থাকিয়া নানারূপ কুকার্য্য করতঃ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি। সেন বাবুদের জমিদারীতে নায়েব নিযুক্ত হইয়া অবধি নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়া নির্ম্মল স্বভাব কলুষিত করিয়াছি। কত লোকের যে কত প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি তাহার ইয়ত্বা নাই। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমানসে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সন্তানপ্রতিম প্রজাদের উপর অযথা কতই না অত্যাচার করিয়াছি? "উপকারীকে বাঘে খায়" এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা আমি স্বয়ং নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেই সেন বাবুরা আমার হিত সাধন মানসে আমাকে তাঁহাদের জমিদারীর "নায়েব" নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমি অর্থলোভে সেই সেন বাবুদেরই প্রজাপীড়ন করিয়া তাঁহাদের জমিদারীকে ধ্বংসমুখে আনয়ন করিয়াছিলাম। ভাগ্যে দেশে হরিচরণ ঘোষের মত অনেক গণ্য মান্য নিঃস্বার্থপর লোক ছিলেন, ভাগ্যে তাঁহাদেরই

সুমীমাংশায় সেন বাবুরা "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইতে পারিলেন না, ভাগ্যে তাঁহাদেরই সুব্যবস্থায় তাঁহাদের জমিদারীতে ঘরে ঘরে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে এরূপ লোকের অভাব হইলে এতদিন তাঁহাদের জমিদারীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। স্বভাব নষ্ট হইলে লোকের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকেনা।

প্রিয়ে! আমি মহাপাপী, তাই পাপের চরম সীমায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কোমল হৃদয়া, বিশুদ্ধচরিত্রা শান্তিবালাকে তদীয় দেবর নিশিকান্তের সাহায্যে হরণ করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করিবার মানসে কাছারী বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম্মই যাঁর সহায়,ধর্ম্মই যাঁর জীবনের মহাব্রত, সেই সতী শিরোমণির সতীত্ব নষ্ট করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কে আছে? ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করেন, আমি শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারি নাই; এতৎসম্পর্কে আমার অমানুষিক যাবতীয় কার্য্যকলাপ তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ, কাজেই তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার দেখ, তোমাকে বিবাহ করিয়াছি অবধি একদিনের তরে ও প্রাণ খুলিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করি নাই, এমন কি এক মুহুর্ত্তের জন্য ও একটা মিষ্টি কথা বলি নাই। আমি এমনি পাষণ্ড, আমায় ধিক! বল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" এইরূপ আক্ষেপোক্তির পর শোভাস যেন বাত্যাহত তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

সংসারে না ঠেকিলে কেহ শিখে না, তাই বোধ হয় ঠেকার মত গুরু আর নাই; কিন্তু না ঠেকিয়া বা ঠেকিবার পূর্ব্বে যে

শিখে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। ঠেকিয়া শিখিতে হইলে জীবনের এতটা সময় অতিবাহিত হইয়া যায় যে আর তাহা সংশোধন হইবার যথেষ্ট সময় মিলে না, হয়তো তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত, না হয় জীবনান্ত হইতে হয়। শোভাসের পক্ষে ও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

নায়েবী পদ প্রাপ্ত হইয়া অবধি সে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহাতো গিয়াছেই, অধিকন্তু ক্রমশঃই ঋণ জালে জড়িত হইয়া এখন বাস্তুভিটা খানা পর্য্যন্ত ঋণদাতার হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দীপ নির্ব্বাপিত হইলে তৈল দানে যেমন কোনই ফল হয় না, চোর পলাইয়া গেলে সাবধানতা যেমন নিষ্প্রয়োজন, গতাসু ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন করাইয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করাও তেমনি দুরাশা মাত্র। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। বিমোহিত পতঙ্গ যেমন অগ্নিতেই পতিত হইয়া অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, পতনোম্মুখ শোভাসের অদৃষ্টেও বোধ হয় তাহাই হইল! কেন না তাহার গুণবতী ভার্য্যা সুষমা কত প্রকার কৌশল, কত সাধ্য সাধনা, ও অনুরোধ উপরোধ করিয়া পতিকে ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, বা পারিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু বিধির বিধান অপরিহার্য্য, হায়! তাই আজ শোভাস-কুসুম কর্ম্মচ্যুত, সমাজচ্যুত, ও ঋণজালে জড়িত হইয়া একেবারে দুঃখ দৈন্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এমন কি এখন তাহার পরিবর্ত্তন করা এক প্রকার অসম্ভবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

শোভাস! তুমি পূর্ব্বে কেন একটুকু চিন্তা করিলে না? সামান্য চিন্তা ও সতর্কতার অভাবে আজ তুমি এই অবস্থায় উপনীত। এখন তুমি অনুতাপে জ্বল, চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হও, দুরবস্থার নিষ্পেষণ নীরবে সহ্য কর!!! তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, তোমার শান্তি কোথায়? তোমার স্থান কোথায়?

স্থান আছে; আজ তোমার মুখ লুকাইবার স্থান তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী সুষমার ক্রোড়, তোমার স্থান নির্ম্মল চরিত্রা তোমার সহধর্ম্মিনীর পবিত্র হৃদয়; আর তোমার শান্তি সেই অত্যাচার প্রপিড়াতা অর্দ্ধাঙ্গিনী সুষমার নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র প্রেমের মধ্যে। স্থান খুজিয়া লও, দেখিবে সে স্থান নিরুপম, নিষ্পাপ, আজীবন শান্তিময়। তুমি তো সুষমার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, তাই বলি মূঢ়! আর তাঁহাকে অবহেলা করিওনা, দেখিবে তাঁহার ভক্তি ও চেষ্টায় তোমার দুঃখাবসান হইবে। আর কাঁদিও না, এখন সুষমার উপদেশ মত চল, দেখ কুল পাও কি না।

শোভাসকে তৎকৃতকার্য্যের পরিণাম কত কি অনুশোচনা করিতে দেখিয়া সুষমা নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন এবং ইহার পরিণাম যে নিতান্ত ভয়াবহ তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু "বিপত্তে মধুসূদনং" এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন মধুসূদনেরই শরণাপন্না হইলেন। হৃদয়ে বল আসিল, তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁ'র কানে কানে বলিয়া দিল "হতাশ

হইও না, এখনো প্রতিকারের উপায় আছে।" এই কথা স্বপ্নবৎ শ্রবণ করিয়া সুষমার মনের বল দ্বিগুণীত হইয়া উঠিল। তিনি শোভাসকে বলিলেন—কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অবিরত চিন্তায় কোন ফল নাই, প্রতিকারের উপায় অবলম্বন দ্বারাই বরং সমধিক ফল লাভের সুযোগ জুটিতে পারে। সুতরাং আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি এখন হইতে সেই পথ অনুসরণ করিবে।

শোভাস। প্রিয়ে! আমি! যতটা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। আমি শান্তিকে হরণ করিয়া অবধি যেরূপ দুশ্চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি এবং দুর্ব্বিষহ দারুণ হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছি জানিনা তাহার কোন ঔষধ আছে কি না, আমার মনে হয় স্বয়ং ধন্বন্তরী ও তাহা জ্ঞাত নহেন। সুষমে! বল ত আমি দাঁড়াই কোথায়?

সুষমা। নাথ! তোমার এ রোগের কথা তো একদিন ও আমাকে জানাও নাই, জানিতে পারিলে এ দাসী উপশমের যথাশক্তি চেষ্টা করিত। যাহা হউক যেই শান্তিকে হরণ করা অপরাধে তোমার অন্তরে এই গুরুতর রোগের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া তোমার বিশ্বাস, সেই শান্তির নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তুমি রোগমুক্ত হইবে ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আর বিশেষতঃ, তাঁ'কে সন্তুষ্ট করা কোন কঠিন ব্যাপারও নহে, কারণ ভক্তিতে ভগবানকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করা যায়, মানুষ কোন ছার?

শোভাস। তুমি শান্তিকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেছ, এ'টী তোমার বিষম ভ্রম। তাঁহার অভিনব ভগবতীপূজার কথা এবং তাঁহার অপূর্ব্ব তিরোধানের বিষয় তুমি বোধ হয় শুন নাই, শুনিলে কখনো' তাঁ'কে মানুষ নামে অভিহিত করিতে না।

সুষমা। তোমার কথায় আমি বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হইলাম; তুমি যখন তাঁ'কে দেবী মনে করিতে পারিয়াছ তখন তোমার আত্মা যে ক্রমশঃ নির্ম্মল ও উন্নত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস তুমি অচিরে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারিবে; ভগবান তোমার সহায় হউন।

শোভাস। তাঁ'কে পেলে তো সন্তুষ্ট করিব? সে যে এখন কোথায় তাহা কেহ জানে না, নানা জনে নানারূপ বলে। কেহ বলেন তিনি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আবার কেহ কেহ বলেন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া তাঁ'কে কৈলাশে নিয়া গিয়াছেন, কাজেই আর তাঁ'র দর্শন লাভ অসম্ভব। আবার এমন জনরব ও শুনা যায় যে তিনি যোগিনী হইয়া আমাদের এতদ্দেশেই আছেন; কিন্তু কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ ই বলিতে পারে না।

সুষমা। তোমার প্রিয়বন্ধু নিশিকান্ত, যাঁ'র সাহায্যে তুমি শান্তিকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলে তাঁ'র কথা তুমি কিছু শুনেছ

কি ? প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল তাঁ'র কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপার কি ?

শোভাস। তুমি কি শোন নাই ? যে নিশিকান্ত এক সময়ে ঘোর মাতাল বলিয়া জন সমাজে পরিচিত ছিল, সুরা-শিক্ত রুটী ভোজন করাইয়া তিনটী কুকুরকে পর্য্যন্ত সুরাদেবীর পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই নিশিকান্ত নাকি ভগবৎ কৃপায় বেশ শোঁধ্রাইয়া গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে কুকুর তিনটী ও নাকি তাহার অনুসরণ করিয়াছে। তাহার সহধর্ম্মিনী নির্ম্মলা পরে অনেক অনুসন্ধানে তাহার খোঁজ পাইয়া স্বামীর অনুগমন করিয়াছে। ধন্য নিশিকান্ত! ধন্যা নির্ম্মলা!

সুষমা। বটে, বটে ? এ'র চেয়ে তাঁ'র গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ? সীতাদেবী পতিসহ বনবাসিনী হইয়াছিলেন, রাজ্ঞী দময়ন্তী বিপন্নপতি রাজা নলের সহগামিণী হইয়া কত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারতে শুনিয়াছি এরূপ কত ভারত ললনা পতিসহবাসে থাকিয়া, পতির চরণ সেবা করিয়া ধন্যা হইয়া গিয়াছেন, নির্ম্মলা ও যে ঠিক তেমনটী হইয়া দাঁড়ায়েছে। যা'ক ওসব পরের কথা, তুমি ও মনস্থির করিয়া "শান্তির" আরাধনা কর না কেন ? "ঢেকি" "ঢেকি" মন্ত্র জপ করিয়া নাকি এক সময় এক বৃদ্ধা ঢেকি বাহন মহর্ষি নারদের সাক্ষাৎকার লাভ

করিয়াছিল, আবার "মরা" "মরা" শব্দ অবিরাম উচ্চারণ করিয়া মহাপাপী রত্নাকর দস্যু রাম নামোচ্চারণে সমর্থ ও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বাল্মিকী মুনি নামে অভিহিত হইয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। লোকের অসাধ্য কিছু ই নাই, চেষ্টা কর, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।

শোভাস। আমার রোগ যন্ত্রণা এখন এত বেশী যে আমি কিছুতেই মনস্থির রাখিতে পারিতেছি না। আমি জাগ্রত অবস্থায়ও নানারূপ বিভীষিকা দর্শন করিতেছি। শান্তি যেন অসিহস্তে আমার শিরচ্ছেদনে উদ্যতা হইয়াছেন, আমি ঘাঁড় পাঁতিয়া দিলাম আর সেই দেবী আমার শিরচ্ছেদ না করিয়াই সহসা আকাশপথে অদৃশ্যা হইলেন। পাপীর শিরঃস্পর্শে পাছে বা তাঁ'র অসি কলুষিত হয় এই মনে করিয়াই বুঝি তিনি চলিয়া গেলেন, অহো! আমি কি ঘোর পাপী! নরকেও আমার স্থান নাই। অই, অই দেখ আবার আসিতেছেন, মাগো! মলেম গো আমি লুকাই কোথা? এইরূপ বিভীষকা দর্শনে প্রলাপোক্তি করিতে করিতে যখন শোভাস একেবারে মূর্চ্ছিত তখন সুষমা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীগণ জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া নানা চেষ্টায় শোভাসের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে এই রোগের প্রত্যাবৃত্তি দেখা যাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শোভাসের গুরুতর পীড়ার কথা শীঘ্রই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। স্বভাবের দোষ থাকিলেও তাহার এমন কতকগুলি গুণ ছিল যে তাহাতে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সে মিষ্টভাষী ও পরদুঃখকাতর ছিল! সে, কিছোট কিবড় সকলের সহিতই মিশিত, নিকৃষ্ট জাতিকেও কদাচ ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। কেহ কোন বিপদে পড়িয়াছে সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। ঘটনাচক্রে কুলোকের সংশ্রবে আসিয়া তাহার নির্ম্মল স্বভাবটী কলুষিত হইয়াছিল, নচেৎ সে যে তাহার স্বভাবের গুণে, দেশে গণ্যমান্য লোক বলিয়া সন্মানিত হইত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহার গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিল এমন কি কোণার কুলবধূ পর্য্যন্ত বাদ রহিল না! আসিলনা কেবল তার কনিষ্ঠ ভাই প্রভাস মিত্তির; সে জ্যেষ্ঠ ভাইকে বিপদাপন্ন দেখিয়া দূরে সরিয়া পড়িল, পাছে বা এখন চিকিৎসার যাবতীয় খরচপত্র তা'কে বহন করিতে হয়। প্রভাসের স্ত্রী বগলা স্বামীর এবম্বিধসিদ্ধান্ত প্রশংসয়নীয় নয় ভাবিয়াও তিরস্কারের ভয়ে বেশী কিছু বলিল না, কেবল দু'একবার অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া ক্ষান্ত রহিল, শেষে আর এ বিষয়ে খেয়ালই করিল না।

যাহারা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ দেশে থাকিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করিতে, কেহ বা হাওয়া পরিবর্ত্তনের পক্ষে মত দিলেন। অবশেষে স্থির হইল দেশের সুযোগ্য চিকিৎসকের ব্যবস্থামত চিকিৎসা চলিবে, এবং তাহার ফলাফল না দেখিয়া কোথাও যাওয়া হইবে না। চিকিৎসা কার্য্যের সমস্ত ব্যয় ভার উপস্থিত জন সাধারণ চাঁদা তুলিয়া বহন করিবেন বলিয়া তাহারা প্রতিশ্রুত হইলেন। যখনকার কথা বলা হইতেছে তখন গ্রামের শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর ভীষজ্‌রত্ন কবিরাজ মহাশয়ের যথেষ্ট নাম ডাক ছিল; এক্ষেত্রে তাঁহাকেই শোভাসের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। বলা বাহুল্য, মাসাধিক কাল চিকিৎসা করিয়া তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বরং পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। এসময় পতিগত প্রাণা সুষমার মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল তাহা সহজেই অনুমেয়। সুষমা ব্যাপার গুরুতর ভাবিয়া পতিকে কলিকাতা শম্ভুনাথ হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করান যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন; কিন্তু তা'দের সঙ্গে যা'বে কে, এবিষয় চিন্তা করিয়া সুষমা বড় অস্থির হইয়া পড়িল। "ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সুষমা পাড়ায় বাহির হইলেন। কত লোকের খোসামোদ করিলেন কিন্তু পরদুঃখ কাতর একমাত্র বৃদ্ধ হরি ঘোষ ব্যতীত আর কেহ শোভাসকে তথায় নিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না। সকলেই কোন না কোন অজুহাত্ দেখাইয়া সুষমার

অনুরোধ প্রত্যাহার করিল, হরিঘোষ মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করা হইল পর তিনি সঙ্গে যাইতে কোন ওজর আপত্তি করিলেন না। আপত্তি না করার প্রধান কারণ সংসারে তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না ; তাঁহার স্ত্রী ছিল না যে তাহার বিরহে তিনি অস্থির হইয়া উঠিবেন, ছেলেপেলেও ছিল না যে তাহাদের অদর্শনে তাঁ'র বিশেষ কষ্ট হইবে। দ্বিতীয় কারণ বিদেশ ভ্রমণেও তীর্থস্থান দর্শনে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, আর তৃতীয় কারণ বিপদকালে একজন অসহায়া স্ত্রীলোকের অনুরোধ রক্ষা। কারণ যাহাই থাকে থাক তাহা নিয়া অনর্থক মাথা ঘাঁমান নিস্প্রয়োজন, তবে কিনা বৃদ্ধবয়সে দেশ ভ্রমণ ও তীর্থস্থান দর্শনে যে তাহার ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক তিনি ভাল দিন দেখিয়া শোভাস ও তৎপত্নী সুষমাকে নিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া পরদিন যথা সময়ে শম্ভুনাথ হাস্‌পাতালে শোভাসের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয়, ক্রমাগত ছয় মাস কাল এখানে চিকিৎসা করাইয়াও যেন রোগের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সিভিল সার্জ্জন সাহেব বিশেষ যত্ন নিয়া চিকিৎসায় কোন ফল দর্শাইতে না পারিয়া অবশেষে হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন। কাজেই শোভাসকে প্রথমতঃ বৈদ্যনাথ তৎপর মধুপুর, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া হইল কিন্তু তাহাতেও

তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। অনন্যোপায় হইয়া সুষমা স্বামীকে নিয়া অবশেষ হিন্দু তীর্থ পর্য্যটনে যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পতো করিলেন, এখন টাকা কোথায়? হাঁত-খরচার যে পরিমাণ টাকা আছে তাহাতে স্থান পরিবর্ত্তন না করিতে হইলে, মাসেক দেঁড় মাস কায়ক্লেশে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা নিঃশেষ হইয়া গেলে উপায়? নানারূপ দুশ্চিন্তায় সুষমা মনে মনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাহার ভগিনী পুত্র শ্রীমান অবনীমোহন ঘোষের কথা মনে পড়িল।

সুষমার ভগিনী সুনন্দা তিন বছরের একমাত্র পুত্র অবনীকে ক্রোড়ে করিয়া বিধবা হ'ন, এবং আঠারো বৎসর বয়সে দেবর হরিমোহনের হাতে অবনীকে তুলিয়া দিয়া পরলোক গমন করেন। তদবধি অবনী খুড়া খুড়ার যত্নে লালিত পালিত ও মোটামোটী শিক্ষিত হইয়া তৎপর কৃষি বিভাগে সামান্য চাকুরী পায়। বর্ত্তমানে সে রাঁচীতে সহকারী সার্ভেয়ার পদে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতন পাইতেছে। ইহা ভিন্ন সে বড় রাস্তার পার্শ্বে "ঘোষ এণ্ড্ কোং" নাম দিয়া একখানা সুন্দর কাঁটা-কাপড়ের দোকান দিয়াছে। অবনীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিষয় লোক মুখে শুনিয়া সুষমা মনে মনে কতই আশীর্ব্বাদ করিতেন।

আজ সুষমা এই অবস্থার বিষয় অবনীকে জানাইয়া কিছু সাহায্য পাইবার আশা করিলেন। কিন্তু আশা! তুমি জন প্রাণীকে সঞ্জিবনী শক্তি না দিলে জীব জগৎ নিশ্চল, নিস্পন্দ।

তোমার ইঙ্গিতেই জীব উধাও হইয়া ছুটে। তোমার ক্রোড়েই তাহারা আশ্রয় নিয়া শান্তি পায় এবং লয় প্রাপ্ত হয়। ধন্যা তুমি! ধন্য তোমার অসীম ক্ষমতা!! তাই কবি বলিয়াছেনঃ—

আশায় সকলি হাসে, আশায় আনন্দে ভাসে,
আশায় বিফল হ'য়ে কাঁদে আর বার।
আশায় জীবন রয়, আসায় সকলি হয়,
আশা ছেড়ে দিলে ভবে, সকলি অসার।

মাসীমা'র দুরবস্থার বিষয় পত্রে জ্ঞাত হইয়া অবনী ২৫৲ টাকা ডাকে পাঠাইলেন। তাহা পাইয়া ও গত্যন্তর না দেখিয়া আবার সুষমা নিজের সোনার বালা, অনন্ত ও হার ইত্যাদি প্রায় চারিশত টাকা মূল্যের অলঙ্কার ডাকে ইন্সিওর করিয়া তৎসহ নিম্নলিখিত একখানা পত্র লিখিয়া ভগিনী পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

•

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম।

দানপুর, কটক
২১শে ভাদ্র, বুধবার।

প্রাণাধিকেষু,—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সমাচার এইঃ—স্নেহের অবনী, তোমার প্রেরিত ২৫৲ টাকা পাইলাম। তোমার এই সাহায্য আমার বর্ত্তমান অবস্থায় যে কি গুরুতর প্রয়োজনে আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য। এখন আমার আরও শতাধিক টাকার দরকার,

তাহা না হইলে আর দু একটী স্থানে (যেখানে তোমার মেসো মহাশয়কে নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি) যাওয়া হয় না। বাবা! আমি বড়ই বিপন্না, তিনি না বাঁচিলে আমার জিনিষ পত্রের দরকার কি? তাই সঙ্গীয় জিনিষগুলি তোমার নিকট রাখাই সঙ্গত মনে করিয়া ইহা পাঠাইলাম, মনে কিছু করিও না। প্রাপ্তি সংবাদ সহ তোমার যাবতীয় কুশল সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিও ইতি---

আশীর্ব্বাদিকা

"তোমার মাসী মা"

যথাকালে পার্শেল পাইয়া অবনী অবাক্। তারপর কত কি চিন্তা করিয়া পর দিনই আবার ৩০০৲ টাকা মণি অর্ডার করিলেন।

টাকা পাইয়া অতঃপর সুষমা রুগ্ন স্বামীকে নিয়া অমারিক বৃদ্ধ হরিঘোষকেসহ নানা তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাহারা পনর দিনের কম ছিলেন না। কিন্তু আজ প্রায় মাসেক যাবৎ এই হরিদ্বারে আসিয়া প্রথমতঃ যদিও শোভাসের চেহারার যৎসামান্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল, তাহা কিন্তু শেষে স্থায়ী হইল না।

হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা, নানাদেশ দেশান্তর হইতে সমাগত কত কত মহাপুরুষ এ'সময়ে এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাই ইহাকে কুম্ভমেলা না বলিয়া "সাধুর হাঁট" বলিলেও অত্যুক্তি হয়

না। কারণ যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর সাধুগণের পবিত্র, প্রশান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি ভিন্ন আর বড় কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, এই সাধুদের মধ্যে কেহ বা শুদ্ধ ফল মূলাহারী, কেহ বা একরূপ অনাহারী, বায়ু মাত্র সেবন করিয়া ভগবৎ আরাধনায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে হিংসাদ্বেষাদি পশুপ্রবৃত্তি গুলি নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হইয়া মানুষ দেবভাবে তদ্গত চিত্ত হয়, পাপের লেশ মাত্র তখন শরীরে অবস্থান করিতে পারে না। পবিত্র শ্মশান ক্ষেত্রে যেমন অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, সাধু সহবাসে, সাধুর বচন সুধা শ্রবণে শরীরে ও মনের সনির্ব্বন্ধ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা সৎ, পাপকার্য্য হইতে নিয়ত দূরে থাকিয়া সৎভাবে জীবন যাপন করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত বা একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা এজন্য বোধ হয় তীর্থ ভ্রমণ ভালবাসেন; আর যাঁহারা রোগী, ডাক্তার কবিরাজগণ যাঁহাদিগের রোগ মুক্ত হইবার আশা নাই বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, তাহারা ও নিরাময় হইবার আশায় অবশেষে এসকল স্থানে আসিয়া থাকেন। আজকাল এই শ্রেণীর অসুস্থ ব্যক্তিদের সংখ্যা এসকল স্থানে একেবারে কম নহে। শোভাস-কুসুমও শেষোক্ত শ্রেণীরই একজন এখানে আছেন।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলার নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে অনেক সাধু মহাত্মাগণ একে একে কোন এক নূতন তীর্থ স্থানে প্রস্থান করিতেছেন। বৃদ্ধ হরিঘোষ মহাশয় সাধু পরম্পরায় এই আধুনিক

তীর্থের মহিমা শুনিয়া তৎসমুদয় শোভাস ও সুষমাকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া সুষমা মনে মনে ভাবিলেন—কত তীর্থস্থানই দেখা গেল ভাগ্যদোষে কোন ফলইতো দর্শিল না, কিন্তু এত সাধু মহাত্মাগণ যখন তথায় গমন করিতেছেন তখন আমরা ও ভাগ্যলিপীর শেষ পর্য্যন্ত দেখিনা কেন ?

সুষমাকে নীরব দেখিয়া শোভাস এতক্ষণ আর কিছু বলিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু যখন সুষমার দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল তখন আগ্রহের সহিত বলিল—দেখ, যা হ'বার তা'তো হ'বেই, তবু এই তীর্থস্থানটী আমার দেখার ইচ্ছা, তুমি কি বল? সুষমা। আচ্ছা তা'ই হ'বে, এটী আর বাকি থাকে কেন ?

যথা সময়ে হরিঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় একদল সহগামী যাত্রী জুটিল এবং সেই সুযোগে তাঁহারাও যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভজসানন্দং পরমানন্দম্
নির্দ্বন্দং কুরু চিত্তম্ তে।
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত শোভিতদণ্ডং
তদপিন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥
ভজসানন্দং ইত্যাদি।

আজ মাঘের শুক্লাদ্বাদশীর গভীর রজনীতে মন্দির প্রাঙ্গনে বসিয়া এক মহাপ্রাণ অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কম্পিত কণ্ঠে এই গানটী গাহিতেছেন। শুভ্র জ্যোৎস্নায় আনন্দবাঁগের মনোহর দৃশ্য যেন আরও মনোরম দেখাইতেছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসিনী—“বাবা, বাবা” বলিয়া ডাকিতেছেন, কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিকটস্থ হইয়া মলিন বদনে বৃদ্ধের পশ্চাতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—“এই ক্ষনভঙ্গুর জীবন সার্দ্ধ এক শতাব্দিকাল ভোগ করা গেল অবশেষ তুই কিনা আরো’ বেঁধে রা’খ্‌তে চাচ্ছিস্? ক্ষান্ত দে মা, আর পাগলামো করিস্‌নে! রাত্রি বেশী নেই, এখন চল।”

কালের পরিবর্ত্তনে ও স্থান মাহাত্মে আজ আনন্দবাঁগ একটী উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। স্থানটী যেমনি মনোহর

তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ, পরন্তু দেবীমা'র আগমনের পর হইতে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতীতে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারন করিয়াছে। তাই বুঝি দেশ দেশান্তর হইতে কত ত্যাগী মহাপুরুষ, কত যাত্রী, কত ভ্রমনেচ্ছুগণ এখানে আসিতেছেন, আবার চলিয়া যাইতেছেন। দেবতার প্রিয়স্থান কি জীবের অপ্রিয় হইতে পারে ?

দু'দিন গত হইয়াছে শোভাসকুসুম, সুষমা ও হরিঘোষ এখানে আসিয়াছে। পথশ্রমে একেই তো একটুকু ক্লান্তি আসে তদুপরি রোগ যন্ত্রনায় শোভাস সহসা বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সুষমার অনুরোধে বৃদ্ধ হরিঘোষ কিঞ্চদধিক দেড়-প্রহরের সময় স্নানটা সারিয়া ৺ দেবদেবীর নির্ম্মাল্য পাওয়ার আশায় মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—অত্যুচ্চ দুইটী মন্দির পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত, একটীতে বিশাল দেহ শিবমূর্ত্তি, অপরটীতে নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা মায়ের প্রস্তর মূর্ত্তি। প্রথমটাতে এক প্রৌঢ় নবীন সন্ন্যাসী এবং দ্বিতীয়টীতে রূপলাবন্যবতী এক ভৈরবী ধ্যানমগ্না। উভয়কে দেখিলে মনে ভক্তি ও পবিত্রতার ভাব আসে। ইহাদের পরস্পর বাক্যালাপ নাই, কি এক অসীম শক্তিতে ভগবৎ প্রেমে মজিয়া, ডুবিয়া আছে। নিক্ষিপ্ত নির্ম্মাল্য লইয়া ঘোষ মহাশয় ফটক দ্বারে চলিলেন।

ফটকের অনতি দূরেই অর্থাৎ অনুমান দুইশত হস্ত ব্যবধান একটী প্রকাণ্ড সরোবর। সরোবরের উত্তর পারে ফটক বরাবর প্রশস্থ চত্বল বিশিষ্ট একটী বাঁধা ঘাট, চত্বলের প্রায় চারিদিকেই

বসিবার পাকা বেঞ্চী, শুধু যাতায়াতের জন্য মধ্যে কতকটা ফাঁক ; ঘাঁটের উভয় পার্শ্বে দুইটী তুলশী স্তবক, তথা হইতেই সিড়ি আরম্ভ হইয়া সরোবরগর্ভে অনেক দূর পর্য্যন্ত লামিয়াছে। সরোবরের স্বচ্ছ জলে মৎস্যক্রীড়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, সামান্য কিছু খাঁবার ছড়াইয়া দিলে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যগুলিও অত্যল্প জলে নির্ভয়ে আসিয়া দেখা দেয়। ঘাঁটলার পশ্চিম দিকে গোলাকার রোয়াক বাঁধান পঞ্চবটী ; পঞ্চবটীর বেল, আমলকি, শ্বেতকরবী, জবা ও তুলশীবৃক্ষ পাদমূলে যাত্রীগণ সভক্তি জল সিঞ্চন করিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকে পুষ্পোদ্যান ; একটী প্রাচীন গুরুঞ্চী পুষ্পবৃক্ষ, কয়েকটী রক্ত জবার ঝাঁর, শেফালিকা, টগর, গন্ধরাজ ইত্যাদি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ সকল যেন পরস্পর সৌহার্দ্দে আবদ্ধ ; তাই তাহারা ঋতুপরিবর্ত্তনেও দায়িত্ব জ্ঞানে একে অন্যের ভার নিয়া দেবার্চ্চনের পুষ্প যথাসময়ে জোগাইতেছে, যদিই বা তাহাতে কাহারো' কোন ত্রুটী হয়, প্রাচীন গুরুঞ্চী ও সরলা জবা তাহা সারিয়া দেয়।

অপর তিন পারে নারিকেল, গুবাক, তাল, ঝাউ এবং স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষে সরোবরটীর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। পারের নিম্নেই প্রান্তর, ইহা দক্ষিনে একটী শাখানদী পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ। প্রান্তরস্থিত আম, কাঠাল, বাদাম, শিমূল, অশ্বত্থ-বৃক্ষগুলী ঘোর ঝঞ্জাবাতে যেন বহুকাল যাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া দুরস্থ পথিককে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে সুশীতল ছায়া দান

করিতে ডাকিতেছে। এই প্রান্তরেই মেলা বসিয়া থাকে, মাঘিপূর্ণীমা আসিয়াছে, তাই দূরাগত দোকান পঁশারিরা সর্ব্বাগ্রে সুবিধাজনক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিতেছে। পশ্চিম প্রান্তরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, রামাউৎ, ফকির, দরবেশ; প্রয়োজনীয় সামান্য স্থান অধিকার করতঃ যাঁর যাঁর ভাবে সে সে বসিয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে নানাবিধ তামাসা ও বাজি ওয়ালারা তাঁবু ফেলিয়া কতপ্রকার বাদ্যধ্বনীতে দর্শকগণের চিত্তাকর্ষন করিতেছে।

পঞ্চবটী হইতে কিঞ্চিত পশ্চিমে যাত্রী মহল্লায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়া আমাদের শোভাস্‌কুসুম, সুষমা ও হরিঘোষ বাসা করিয়া আছেন।

রাত্রি প্রভাতেই মাঘিপূর্ণীমা, তাই কত যাত্রী, কত দোকানী, কত কার্ত্তনের দল হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, এবং সহৃদয় স্বেচ্ছাসেবকগণ ও গ্রাম্য সেবক সমিতির কর্ম্মীগণ দলে দলে "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনীতে যেন মেদিনী কম্পিত করিয়া আসিতে-ছেন। যাঁহারা পৌহুছিয়াছেন তাঁহাদেরও বিরাম নাই; আনন্দে রাত্রিটা কাঁটাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নাম কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া কেহ বা নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে হাতে হাতে তাল রাখিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। মন্দিরের সেবকগণ সময় সময় সব দিক পর্য্যবেক্ষন করিতেছেন—আজ আনন্দবাঁগে নিরানন্দের লেশ মাত্র নাই, সকলই যেন আনন্দময়।

এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী যাত্রী মহল্লা দিয়া যাইতেছেন; এমন সময় রোগীর ক্রন্দনধ্বনী শুনিয়া উভয়ে দাঁড়াইলেন, একটু চুপি দিয়া দেখিয়া আবার সরিয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী কি যেন একটু চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন—"ও যেমন পাপ করেছে তেমনি ফল ভোগ করছে। ইহা প্রকৃত রোগ নয়। পাপের তাড়না মাত্র।"

সন্ন্যাসিনী। উঃ কি ভীষণ যন্ত্রনা! কি হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ!! স্ত্রীলোকটীর চক্ষের জল বস্তুতঃই মর্ম্মস্পর্শী, ও'র তো কোন অপরাধ নাই। এখন ইহার প্রতিকারকল্পে একটুকু চেষ্টাকল্পে হয় না কি?

সন্ন্যাসী। পাপী পাপের ফল ভোগ করবেই করবে। ও'র কৃত পাপের তুলনায় এ তো সামান্য যন্ত্রণা, ও'র অদৃষ্টে আরও যে কি আছে কে জানে?

সন্ন্যাসিনী। এমন কি গুরুতর পাপ করেছে যে ইহার অদৃষ্টে ততোধিক যন্ত্রণা ভোগ আছে?

সন্ন্যাসী। সতীর সতীত্ব নাশ, মাতৃসম্ভবা অসহায়া রমণীকে অপহরণ করা, ধর্ম্মনাশের চেষ্টা। একদা মদগর্ব্বে গর্ব্বীত এই নরপিশাচ ইত্যাকার জঘন্য কাজ করিতে অনুমাত্র ও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। ছিঃ ছিঃ, নরক নরক!

সন্ন্যাসিনী। নরক, নরক কি বল, নরকেও যে ও'র স্থান নাই!

সন্ন্যাসী। (স্বহাস্যে) তবে কি ও'র স্থান স্বর্গলোকে?

সন্ন্যাসিনী। আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছো নাকি?

সন্ন্যাসী। ঠাট্টা নয়, আচ্ছা নরকে ও যদি স্থান না হয় তবে ও'র স্থান কোথায়?

সন্ন্যাসিনী। জানিনা এরূপ দুর্বৃত্ত পাষণ্ডের জন্য স্রষ্টা নরক হইতে নিকৃষ্টতম কোন স্থান সৃজন করিয়াছেন কি না।

সন্ন্যাসী। তুমি দেখ্‌ছি ধাঁ ক'রে ও'কে চিনে ফেল্লে? আমার ধারনা সত্য নয় কি?

সন্ন্যাসিনী। ধ্রুব সত্য। তখন যদি সিদ্ধেশ্বর বাবা দেবী-মাকে নিয়ে না আস্‌তেন তবে যে দুরাত্মা তাঁর সর্ব্বনাশের শেষ চেষ্টা আর একবার না দেখ্‌ত তাই বা কে জানে?

এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যসিনী যথাক্রমে **ভবানন্দ ও মহাশ্বেতা** নামেই এখানে পরিচিত, তাই আমরাও এখন উহাদিগকে ঐ নামেই ডাকিব।

ভবানন্দ। ও যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে এ'র চেয়ে ও'র মরন ও ভাল।

মহাশ্বেতা। মরনের সঙ্গে সঙ্গেই তো ও'র সব জ্বালা মিটিয়া যাইবে, তবে আর বেশী শাস্তি ভোগ কি হইল?

ভবানন্দ। তুমি দেখ্‌ছি ভারী শুভাকাঙ্ক্ষিণী, তাই ও'র শাস্তি শাস্তি ক'রে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লে যে?

মহাশ্বেতা। ও'র আ'রো দুর্গতি আছে বলিয়া আমার ধারণা, তুমি কি বল?

ভবানন্দ। কল্যাণি! পুষ্পদন্ত নামে গন্ধর্ব্বরাজ মহাদেবের স্তব করিতে করিতে এক যায়গায় বলিয়াছেন ঃ—

প্রজানাথং নাথ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং বিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥

অর্থাৎ একদা স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সন্ধ্যানাম্নী স্বীয় কন্যার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলে পর ভীতা সন্ত্রস্তা সন্ধ্যা মৃগীরূপা হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তখন ব্রহ্মাও মৃগরূপে তদনুসরণ করেন; ইহা দেখিয়া মহাদেব শরত্যাগ করিলে, সেই বাণভয়ে ব্রহ্মা শিবের হস্তগত হয়েন। তাই গন্ধর্ব্বরাজ বলিয়াছেন ঃ—হে স্মরহর! হে নাথ! ত্রিলোক ভ্রমণকারী ত্রাসিত ব্রহ্মাকে তুমি তখন এরূপ বল দ্বারা হস্তগত করিয়াছ যে সেই মৃগ গ্রহণ জনিত বেগফল অদ্যাপি তোমা হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই। (শিবের ধ্যানেও আছে "পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং")

ও'তো এ যাবৎ অনেক কষ্টই সহ্য করিতেছে। অতঃপর ও'র কপালে এতদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড ভোগ আর কি হইতে পারে?

মহাশ্বেতা। পাপের দারুণ জ্বালায় আরও জ্বলিবে, সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া খাঁক্ হইবে। কা'র সাধ্য তাহা নিবারণ ক'রে?

ভবানন্দ। তারপর, তারপর?

মহাশ্বেতা। তার পর চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত 'ও'র দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ নিরন্তর চলিবেই, এবং এত কষ্ট করিয়া আসিয়াও দেবীমা'র দর্শন লাভ ইহার পক্ষে কঠিন হইবে। কেন না চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাঁ'র দর্শন লাভ 'কাহারো' অদৃষ্টে ঘটে না।

তখন হরিঘোষ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"তবে উপায়" ? কারণ এতক্ষণ তিনি কান পাতিয়া সব শুনিয়াছেন। সহসা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী অদৃশ্যা হইলেন।

রুগ্ন শোভাসের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা সুষমা "তবে উপায়" শব্দটী সহসা শুনিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরিঘোষের মুখ থেকে কথাটী নির্গত হইয়াছে জানিয়া তিনি যেন শিহরিয়া উঠিয়া, চারিদিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রবল ঝটিকার সময় কর্ণধারের মুখ নিঃসৃত এরূপ ভীতি ও নিরাশব্যঞ্জক বাক্য শুনিলে আরোহীদের অবস্থা যেরূপ হয়, হরিঘোষের মুখে হঠাৎ এরূপ হতাশবাণী শুনিয়া সুষমার মানসিক অবস্থাও তদ্রূপ দাঁড়াইল, তাই তিনি ব্যাকুলচিত্তে বলিলেন—দাদা ঠাকুর! কোথাও আগুণ লাগিয়াছে কি ?

হরিঘোষ। না দিদি, আগুণ না। আমার স্বভাবটা তো জান; নানা দুশ্চিন্তায় কত কি বলে থাকি।

সুষমা। দাদা ঠাকুর। সবদিকে আনন্দ কোলাহল, এ'র মধ্যে হঠাৎ আপনার দুশ্চিন্তা আসার সম্ভাবনা ত কিছুই দেখি

না। আমি কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, আমার মাথার দিব্বি আর গোপন কর'বেন না, স্পষ্ট করে বলুন।

সুষমার আগ্রহাতিশয্যে ঘোষ মহাশয় আর চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না, তখন তিনি শোভাস সম্বন্ধে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর কথোপকথন আদ্যোপান্ত সুষমাকে জানাইলেন; এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে যে শোভাসের ভাগ্যে দেবীমা'র দর্শন লাভ হইবে না ইহা স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া বলিলেন।

সুষমা। আজ আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ শান্তি মা এখানে দেবী মা রূপে পরিচিতা এই সংবাদ আমাদের জানিবার অন্য কোন উপায় ছিল কি?

হরিঘোষ। তা ঠিক, তবে কথা হচ্ছে কি জান, শোভাসের চিত্তশুদ্ধি হ'য়েছে কিনা তা এখন তুমি বলিতে পার।

সুষমা। শু'নেছি তীর্থ-পর্য্যটন ও সাধুসহবাসে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পবিত্রতা আসে। ও'র আত্মগ্লানী যথেষ্টই আসিয়াছে; তীর্থ-পর্য্যটন ও তদুপলক্ষে অনেক সাধু মোহান্তের দর্শন লাভই তো হইয়াছে। তবে এখন আপনি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না কেন? আর দেবী মা যখন এখানে আছেন তখন যে উপায়েই হউক তাঁ'র দর্শন লাভ হওয়া চাই ই।

হরিঘোষ। তীর্থ-পর্য্যটনে ও সাধুসহবাসে চিত্তশুদ্ধি হয় বটে, ইহা শতসিদ্ধ কথা; কিন্তু আত্মগ্লানিতে উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য ও চিন্তার বিষয়।

সুষমা। তাঁ'র শরীর টা যেন এখন একটুকু ভালই দেখা যা'চ্ছে, আপনি দয়া ক'রে একবার তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করলে সব বুঝা যা'বে ; তবে চলুন।

সুষমার অনুরোধে ঘোষ মহাশয় যাইয়া রুগ্ন শোভাসকে আমূল বৃত্তান্ত সমস্ত জানাইলেন। শান্তি এখানে আছে এই কথা শুনিবা মাত্র তাহার মুখশ্রী ক্রমশঃ যেন বিবর্ণ হইতে লাগিল। আর কথাটী নাই, অতীত ডুষ্কার্য্যের কথা মনে পড়িয়া ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেট্ করিয়া রহিল, আর আত্মগ্লানীতে তাহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সুষমা চতুরা ও বুদ্ধিমতী, সে তখনি স্বামীর পায়ে পড়িয়া' কাতর স্বরে বলিলেন—"নাথ ! যা হ'বার তা হ'য়েছে, এখন লজ্জা করলে আর কি হ'বে ? বরং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পন কর দেখিবে তিনিই তোমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। একাগ্রতা অবলম্বন কর নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইবে।"

সুষমার কথায় যেন তাহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল, আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাই সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল, আত্মগ্লানীর জ্বালায় যেন পুড়িয়া ছাই হইতেছে তাই এক এক বার কাতস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। এমন সময় একদল লোক—

"পাপী আর কত যাবি তল,
সময় থাক্‌তে হরিবল হরিবল।"

এই গানটী গাহিতে গাহিতে যেন আকাশ নিনাদিত করিয়া তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। শোভাস সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল এই দলের পুরোভাগেই গঙ্গারাম পুরের বহুলোক ভগবানের নাম কীর্ত্তনে মাতোয়ারা ও দিশেহারা হইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে এমনি ভাবে চলিয়াছে যে তাহাদের যেন অন্য কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। শোভাস্, সুষমা ও ঘোষ মহাশয় এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, শোভাসকুসুম মনে মনে বলিলেন— "তাইত এমনি না হইলে কি তাঁ'র সান্নিধ্য-লাভ হয়? এমনটী না হইলে কি তিনি যাকে তাকে ধরা দে'ন? আমি মহাপাপী তাই জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি, পুড়িয়া খাঁক্ হইতেছি।" শোভাসের ইচ্ছা সে ও ঐ রূপ নাচিয়া গাহিয়া দেবীমা'র মন্দিরের দিকে যায়; তাই সে হঠাৎ কিয়দ্দুর অগ্রসর হইল, আর পারিলনা, মন্দির প্রাঙ্গনের এক ধারে বসিয়া পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময় কতিপয় সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র বেদ সুরে গাহিতেছেন।—

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোহং।
আত্মজ্ঞান বিহীনা মূঢ়া
স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥

আবার দেখিলেন পশ্চাদ্দিক হইতে আর এক দল সমস্ত গোলমাল ভেদ করিয়া নিশান হস্তে গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা গাহিতেছেন :—

আয় নারে ভাই নেচে গেয়ে (দেবী) দরশনে যাই।
(ডাকি) ভক্তিভরে মধুরস্বরে দেখব দেখা পাই কি না পাই ॥
(মোদের লজ্জা সরম ছেড়ে দিয়েরে)
(যত পাপী তাপী ছুটে আয়রে)
(ডাকি) ভক্তিভরে মধুরস্বরে দেখব দেখা পাই কি না পাই
(ইত্যাদি)

শোভাস যেই দিকে তাকায় সেই দিকেই লোকেলোকারন্য, মহা কোলাহল, সকলেই যেন তাহাকে ধিক্কার দিয়া, পদদলিত করিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। তিথি মান অতিত হইয়াছে তবুও কীর্ত্তন থামিতেছে না। শোভাস আত্মহারা, অস্থিরচিত্ত, ব্যাকুল, তাই ক্ষণে ক্ষণে উধাও হইয়া মন্দিরের দিকে বেগে ছুটিতেছে, আবার অভেদ্য জনতা দেখিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িতেছে। হরিঘোষ ও সুষমা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছে বসিতেছে, আবার ছুটীতেছে, আবার বসিতেছে। তাহারা কি করিবে? শোভাসের দারুণ জ্বালায় তাহার রক্ত শিরায় শিরায় দ্রুত প্রধাবিত হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্বিগুনীত করিয়া তুলিয়াছে, কা'র সাধ্য তাহা রোধ ক'রে? রোগক্লিষ্ট

শোভাসের পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; তখন হরিঘোষ ও সুষমা অগত্যা তাহাকে নিয়া গৃহে ফিরিলেন।

কি বালাই ! আবার ফকিরবেশী এক সাজ-ওয়ালা যেন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছে ঃ—

আজব্ দুনিয়ার এ কি দেখি আজব্ কারখানা।
(ওরে) হ'চ্ছে কত গাঁছের পাতা পড়্ছে আবার খঁসিয়ে,
আগুণেতে পুঁড়্ছে ঘঁশি গোঁবর উঠ্ছে হাঁসিয়ে।
মর্‌ছে লোক সর্ব্বদায় শ্মশানেতে হচ্ছে ছাঁই
তবু লোকে ভাব্‌ছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না ॥

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, মন্দিরের সম্মুখ হইতে সমস্বরে "হর হর বম্ বম্, হর হর বম্ বম্, জয় মহাদেও কি জয়, জয় কালী মাইকি জয়" গগন ভেদী শব্দ উচ্চারিত হইল আর শত শত কণ্ঠে চতুর্দ্দিক হইতে যেন সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আশ্রমাধিপতি বাবা সিদ্ধেশ্বর আজ সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর রজনীতে শুভ মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিবেন, তাই তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া এইরূপ জয় ধ্বনি ও তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছেন। এই সংবাদ মুহুর্ত্তমধ্যে ঘোষিত হওয়ায় দলে দলে লোক আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন করিতেছে।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই বাবার শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এখন তাঁহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। দেবী মা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে তালবৃন্ত হস্তে উপবিষ্টা থাকিয়া মস্তকে বাতাস

দিতেছেন আর অনিমেষ লোচনে মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু ফেলিতেছেন ; অশ্রুবিন্দু দুই এক ফোঁটা সময় সময় বাবার বক্ষেও পড়িতেছে। ভবানন্দ ও মহাশ্বেতা ম্লান বদনে তাঁহার পাদ পার্শ্বে বসিয়া আরাম বিধান করিতেছেন।

এমন সময় বাবা ইঙ্গিত করিয়া ভবানন্দকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"ভবানন্দ! তোমাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হও নাই তো? বাবা বিশ্বনাথের ও মা জগদম্বার কৃপায় তুমি নিয়ত মদ্যপায়ী সেই নিশিকান্ত আজ এখানে ভবানন্দ নামে অভিহীত ; এই মহাশ্বেতাই তোমার সহধর্ম্মিনী পত্নী সাধ্বী নির্ম্মলা তোমার সঙ্গিণীরূপে বহুদিন যাবৎ এখানে আছেন। আর ঐ দ্যাখ আমার মস্তক পার্শ্বে উপবিষ্টা ভক্তির আদর্শময়ামূর্ত্তী—দেবী মা ; জানিও ইনিই তোমার ভ্রাতৃবধু শান্তি। বাল্যে বৈধব্য যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি কত লাঞ্ছনা ; কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও উহার ভাগ্য ফলে মা দশভূজার কৃপায় আজ দেবীমা বলিয়া পরিচিতা। আমি একটা উপলক্ষ মাত্র, তাই উহাকে দীক্ষিতা করিয়া কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতি পালন করিয়াছি এবং যখন উহার ধর্ম্মপ্রাণ ও উদার চরিত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাষ জন্মিয়াছে তখনই এই উইল-পত্র লিখিয়াছি। আমার উইলের মর্ম্ম যথা সময়ে তোমরা অবগত হইবে, তবুও সংক্ষেপে আমার শেষ কথা পুনরায় বলিয়া যাইতেছি। ভবানন্দ! মন্দিরের যাবতীয় কার্য্য দেবীমা'র কর্ত্তৃত্বাধীনে তোমাদ্বারা সম্পাদিত হইবে এবং উইলের মর্ম্মানুযায়ী কাজগুলি যথাসম্ভব সত্বর করিয়া

ফেলিও। শান্তি! দেবী মা আমার! এই উইল-পত্র নেও; আশীর্ব্বাদ করি তুমি মা জগদম্বার কৃপায় মোক্ষ ফল লাভ করিতে সমর্থা হও। ভয় কি? বাবাভোলানাথের ও জগন্মাতা কালার সান্নিধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা, অপরাপর সকলেই তোমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া প্রাণপনে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহা জনসাধারণে শেষ আদেশ। তবে আসি—

হরে রাম, হরে রাম, রা ম রা ম হরে হ—। শুভ মুহুর্ত্তে বাবাসিদ্ধেশ্বরের জীবন প্রদীপ নিবিল, তিনি চিরতরে চক্ষু মুদিলেন। মুক্তপুরুষ, তাই তাঁহার আত্মা অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেল।

বাবার দেহত্যাগ হওয়া মাত্র আনন্দবাঁগে মহাকল্লোল, দীগন্তব্যাপী কীর্ত্তন ও জয় জয়কার হইতে লাগিল, এবং নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত করিয়া তাঁহার পবিত্র শবদেহ পঞ্চবটী তলায় নীত হইলে পর যথারীতি অন্ত্যেষ্ঠী ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। অতঃপর সমাধির উপর তুলশীবৃক্ষ ও পতাকা-স্তম্ভ রোপণ করতঃ অবসাদ মনে একে একে সকলেই ফিড়িল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এখন আর মেলার ধুম্ ধাম্ নাই। যাত্রীগণ অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, গঙ্গারামপুরের সকলেই ফিরিয়াছে, ফিরে নাই কেবল —রমেশ আব দীনেশ দু'ভাই ; তাহাদের উদ্দেশ্য প্রাণের ভগিনী শান্তিবালাকে নিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু সময়ের আবর্ত্তনে তাহার বিপরিত হইয়াছে ; তাহাদের চেস্টা ব্যর্থ হইয়াছে, অতঃপর ভগিনীর সঙ্কল্পিত মহৎ কার্য্যগুলী যাহাতে সত্বর সুসম্পন্ন হয় ভ্রাতাদ্বয় সর্ব্বদাই সেই জন্য ব্যস্ত ও লিপ্ত। বাড়ীর দিকে এখন আর লক্ষ্যও নাই, কেবল আশ্রম নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শনে প্রাণপন সহায়তা করাই যেন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং নিয়ত চেষ্টা।

পক্ষাধিককাল অতিত হইতে চলিল সিদ্ধেশ্বর বাবার তিরোভাব হইয়াছে ; এখন আর শোভাসকুসুমের রোগ-যন্ত্রণা-বোধ নাই। কিরূপে দেবীমা'র দর্শন লাভ হইবে, কি সুযোগে তাঁহার পায় পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, এবং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন কিনা, তাহার পাপমুক্তি হইবে কিনা দিবানিশি সেই চিন্তা ; চিন্তায় চিন্তায় তাহার আহারে রুচি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া কঙ্কালসার হইয়া উঠিল। সুপ্তাবস্থায় আশার উন্মেষে স্বপ্ন দেখিয়া সময় সময় চমকিয়া উঠে। সুষমা অবিরত চিন্তা করিতেছেন— কি উপায়ে স্বামীকে নিয়া দেবীমা'র

চরন প্রান্তে ক্ষমা-ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু কই কোন সুযোগই তো জুটিতেছে না ?

বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয় বরাবরই প্রাতেঃ একটুকু পাঁ-চারি করিয়া থাকেন, ইহা তাঁ'র একটা অভ্যাস। আজ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিমস্তক-নাতিস্থূল-প্রাচীন বেত্রদণ্ড হস্তে সরোবরের পূর্ব্বপার দিয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ গুণ্ স্বরে—

"পার কর হে মাঝি মশাঁয়।
(আমি) পারের আশায় ব'সে আছি
খেঁয়াঘাঁটে অনেকক্ষণ হয়॥"

ইত্যাদি পদপূর্ণ গানটী ধরিয়াছেন।

"ঘোষভায়া এদিকে এ'সো"—কে যেন ডাক্ছে। কিয়দ্দূরেই দেখা গেল আমাদের সেই ন্যায়-বাচস্পতি মহাশয় বার্ত্তাকুবৎ হুকা হস্তে দণ্ডায়মান। পরস্পর দেখা শুনায় উভয়েই আহ্লাদিত হইলেন এবং কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর ঘোষভায়াকে নিয়া নিকটস্থ বৃক্ষতলায় গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া হরিঘোষ দেখেন দুইটী স্ত্রীলোক উপবিষ্টা।

হরিঘোষ। এঁরা কে হে ?

বাচস্পতি। আমার যজমান রমেশ আর দীনেশ দু'ভাই মাঘীপূর্ণিমার উৎসবে এখানে আসে, তার পর আর দেশে ফিরে নাই, এমন কি একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

দু'ভাইয়ের দু'টী স্ত্রী কি ভাবে যে দিন কাটাইতেছে তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। এই ঘোষ পরিবারের সংসারটী ছার খার হওয়ার সুত্রপাৎ কথঞ্চিত আমাদ্বারাও হইয়াছে, তারপর সেই দুষ্কৃতির ফলেই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আমার শেষ গৃহলক্ষ্মী নিস্তারিনী দেবী লোকান্তর গমন করিয়াছেন. আমিও গৃহশূন্য হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতেছি ; তুমি ত ভায়া সবই জান সবই বুঝ।

হরিঘোষ। তার পর ? বলি তারপর কি ঘোষেদের বাস্তু ভিঁটেয় ঘুঁ ঘুঁ চড়া'বার কাজটা বাকি নাকি ?

বাচস্পতি। সামাজিক হিসাবে আমার অতিত কার্য্যকলাপ দৃষ্টে ও'রূপ উক্তি অন্যায় নয়। কিন্তু ভায়া, এখন আমার মানসিক অবস্থা এ'রূপ দাঁড়াইয়াছে যে জীবনপাৎ করিয়াও যদি ঘোষ পরিবারের সামান্য উপকার হয় তাহা করিব। তাই আমি একাই রমেশ ও দীনেশের অন্বেষণে এখানে আসিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। উহাদের দু'ভাইয়ের দু'স্ত্রী, ঐ দেখ আমার মা'দের নিয়ে এ'সেছি। একে রাত্রি কাল তাহাতে আবার অজানা অচেনা স্থানে সঙ্গে এ'দের নিয়ে কোথা যাই ? নানারূপ ইতস্ততঃ করিয়া গত রাত্রিটা এখানেই একেবারে বসিয়া কাঁটাইয়াছি, আমার পরম সৌভাগ্য তাই রাত্রি প্রভাতেই তোমার শ্রীমুখ দর্শন।

হরিঘোষ—হ্যাঁ তাই তো ? আমি দেখছি রমেশ দীনেশের ভাগ্যে শুক্রের দশায় "বৃহস্পতির তুঙ্গ" উপস্থিত, তাই তা'দের

উপকারে তোমার জীবন-পণের প্রতীজ্ঞা! আচ্ছা এখন তোমার মা'দের নিয়ে আমার সঙ্গে এ'সো।

এই কথার পর তাহারা রওনা হইয়া হরিঘোষ অগ্রে এবং তৎ-পশ্চাৎ সকলে পঞ্চবটীতলা রাস্তা ধরিয়া শোভাসকুসুমের কুটীরের দিকে চলিয়াছেন, তখন রমেশ ও দীনেশ দাঁড়াইয়া সিদ্ধেশ্বর বাবার সমাধি মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাজ পরিদর্শন করিতেছে। হঠাৎ তাহারা হরিঘোষ ও বাচস্পতি মহাশয়কে অপর দু'টী স্ত্রীলোক নিয় যাইতে দেখিয়া উভয় ভ্রাতাই সবিস্ময়ে তাহাদের সম্মুখীন হইল; অকস্মাৎ পরস্পর দর্শনে সকলেই যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় দাড়াইয়া রহিলেন। ভ্রাতাদ্বয় বাচস্পতি মহাশয় ও পূজ্যপাদ ঘোষ মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছে। এমন সময়ে ঘোষ মহাশয় বলিলেন, —"রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপের সময় নয়, এখন যেখানে যাইতে হয় চল।" স্ত্রীলোক দুইটীর বিষয় জিজ্ঞাসা না করা হইলেও তাহাদের পরিচয় পাইতে আর বাকি রহিল না। তখন দীনেশ ধীরে ধীরে বউদিদির নিকট যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। নিরূপমা ও মহামায়ার তৎকালীন মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করা নিষ্প্রয়োজন কারণ সুধীপাঠকপাঠিকাগণ তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আমার ধারনা। তদনন্তর অগ্রজের আদেশে দীনেশ সকলকে নিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়, স্থানে স্থানে আশ্রম, ও সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে বিস্তর লোক খাটিতেছে, রমেশ তৎসমুদয় পরিদর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আসিল, কিন্তু তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ ঘোষ মহাশয় সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন উপেক্ষা করিয়া "আবার আসিব, আবার আসিব" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

শোভাসকুসুমকে প্রথম দর্শনাবধিই ভবানন্দ ও মহাশ্বেতা তাহার দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন। তাই তাঁহারা যখন দেখিলেন শোভাসের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তখনই তাহার দুঃখাপনোদন মানসে, বিশেষতঃ বিপন্না সতী সুষমার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে দেবীমা-দর্শন করার সুযোগ জানাইয়া দিতে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হইলেন।

"আমি আর দেশে ফিরিব না, পরমেশ্বর করুণ শেষ জীবনটা যেন এখানেই থাকিয়া যায়"—উদাস প্রাণে কথা কয়টী বলিয়া বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় বিশুদ্ধ শম্বুক হইতে একটিপ্ নস্য লইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পথটা পরিস্কার করিয়া দিলেন। তখন বৈকাল বেলা, দেবীমা মন্দির প্রাঙ্গনে বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আসিয়া দাঁড়াইয়া নবনির্ম্মিত অট্টালিকাগুলি দেখিতেছেন আর নানারূপ কথাবার্ত্তা ও হইতেছে।

"এ'রা কে আস্‌ছে" বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় একটুকু অগ্রসর হইলেন দেখিয়া সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে পড়িল। তাহারা দেখিল এক অশিতীপর বৃদ্ধ অপর একটী অস্থি চর্ম্মশার রোগীকে

জড়াইয়া ধরিয়া সোৎসাহে অথচ অতি সন্তর্পনে এ দিকে আসিতেছেন। বৃদ্ধের গ্রীবা রোগীর শীর্ণ বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত, স্কন্ধে মস্তক রক্ষিত, বোধ হয় যেন সমস্ত দেহভারই বৃদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে পা টানিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠীতা এক রমণী এক হস্তে একখানা তালবৃন্ত অপর হস্তে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে অতি ধীরে যেন অপরাধিনীর ন্যায় আসিতেছেন। তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয় দুর্ভাগিনী দুরারোগ্য মুমুর্ষাবস্থার স্বামীকে নিয়া অবশেষে এই দেব সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন।

ফটক পার হইয়াই সুষমা—"এই যে মা আমার" শব্দে ছুটিয়া আসিয়া দেবী-মা'র পদপ্রান্তে ধরাস্ করিয়া পড়িয়া গেলেন, সেই শব্দ শুনিবা মাত্র রোগী ভাত চকিত ভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া শূন্যের দিকে তাকাইয়া—"আর মের না, আর মের না—আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর—দারুণ পদাঘাৎ; উত্তাপ, উত্তাপ—অসহ্য, অসহ্য—উঃ—পুরে মলেম—আমায় ক্ষমা কর!" বলিয়া ভীষণ চিৎকার করিতে করিতে একেবারে সংজ্ঞাহীন। তৎসঙ্গে বৃদ্ধ ও বাধ্য হইয়া বসিয়া পড়িলেন দেখিয়া সকলেই তৎক্ষণাৎ রোগীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া তাহার সংজ্ঞালাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রোগীকে আর চিনিতে কাহা'রো বাকি রহিল না। অমনি ভবানন্দের ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা সুষমাকে ধরিয়া উঠাইলেন। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া দেবী-মা করুণ দৃষ্টিতে

কিয়ৎক্ষণ কি যেন একটুকু ভাবিয়া মহাশ্বেতাকে বলিলেন—"তোমরা ও আমার সঙ্গে এ'সো।"

দেবী-মা'র আগমণ দেখিয়া সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইল এবং রোগীর মস্তক পার্শ্বে তাঁহার উপবেশনের পর ভবানন্দ, বাচস্পতি, ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জনে বসিয়া রোগীর অবস্থা লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

সুষমা। নাথ, তুমি যাঁ'র দর্শনাশায় এতদিন অতি কষ্টে তিল তিল করিয়া কাটাইয়াছ, ঐ চেয়ে দেখ একাধারে সত্য, প্রেম, পবিত্রতার উজ্জ্বল মূর্ত্তী দেবী-মা তোমার মস্তক পার্শ্বে উপবিষ্টা।

"কই, কই মা আমার" বলিয়া দু'হাতে দেবী-মা'র চরণ ধরিয়া আবার ভীষণ চিৎকার আরম্ভ করিল। তখন দেবী-মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ" এই কথা বলামাত্র বাচস্পতি রোগীর শিরা ধরিয়া হরিঘোষকে অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন "আর কি দ্যাখ্ছ অবস্থা এখন ভাল নয়।" তখনই রোগী-শোভাস চক্ষু মেলিয়া শান্তির দিকে চাহিয়া—"মা—ক্ষমা কর, **অন্তিমে "মা"** —ক্ষ—অ—মা—আ—আ—।" আজ অন্তিমে দেবী-মা'র চরণতলে শোভাসের সব ফুড়াইল! সব শেষ হইল!!

পরিশিষ্ট।

আনন্দবাঁগেই শোভাসের ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া সুসম্পন্নের পর সুষমা আর বাড়ী ফিরিল না ; রমেশ, দীনেশ প্রভৃতি গঙ্গারাম-পুরের অনেকের সান্ত্বনা ও অনুরোধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি বলিতেন—"যাঁ'র পতি নাই তাঁ'র কিছুই নাই" এই মর্ম্মস্পর্শী কথা অন্যে ততটা বুঝুক আর নাই বুঝুক শান্তি কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতেন, তাই তিনি সুষমাকে বিধবাশ্রমের ভার দিয়া রাখিলেন। হঠাৎ একদিন বাচস্পতি ও হরিঘোষ কোথায় চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাদের কোন অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর নিরূপমা ও মহামায়া, স্নেহময়ী শান্তিকে ছারিয়া, রমেশ ও দীনেশের সঙ্গে দেশে প্রত্যাগমন করিল ; ইহার পরও সময় সময় তাহারা আনন্দবাঁগে আসিত।

সদাশয় রাজপুরুষদের তত্ত্বাবধানে গঙ্গারামপুর হইতে আনন্দবাঁগ পর্য্যন্ত "দেবীদ্বার" নামে একটা সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই নিশিকান্ত মাতৃভূমি দর্শন অভিলাষে একবার দেশে যা'ন, তখন গ্রামবাসীদের চেষ্টায় "শ্যামাকান্ত এইচ্-ই-স্কুল" নামে একটা ইংরেজী বিদ্যালয় ও "শান্তিকুটীর" নামে তৎসংলগ্ন একটা ছাত্রনিবাশ খুলিয়া আসিলেন। আর শান্তি ?—কয়েক বৎসর পর আর দেবী-মা'কে কেহ আনন্দবাঁগে দেখিল না, তিনি কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই জানিল না। কিন্তু একদা বিজয়াদশমীর সায়ংকালে ঘোষবাড়ীর কেহ কেহ নাকি শান্তিকে দেখিয়াছে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্যা হইলেন বলিয়া গঙ্গাপুরে একটা জনরব।

বিস্তরেণালমিতি।

অচিরে “মা” প্রণেতা নিখুঁত সামাজিক চিত্র লেখক **শ্রীযুক্ত হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়ের** আরোও কয়েকখানি উপন্যাস।

বিধির নির্ব্বন্ধ—(যন্ত্রস্থ) সামাজিক উপন্যাস। ডবল ক্রাউন এণ্টিক্ কাগজে চক্‌চকে ছাপা। স্ত্রী-শিক্ষার-উপাদেয় পুস্তক, তুলার প্যাডে বাঁধাই মূল্য ৸৹।

বড় ঠাকুর—(যন্ত্রস্থ) নিঃসন্দেহে পিতা পুত্রকে, ভাই ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, উপহার দিতে পারেন। ঘরে ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। এক সঙ্গে ত্যাগের আদর্শে, অন্যদিক কর্ত্তব্যের মাধুর্য্যে, শিক্ষার ও মনস্তুষ্টির উৎকৃষ্ট উপন্যাস, মনোরম বাঁধাই মূল্য—১৲।

সাহিত্যরথী—শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী।

দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন (২য় সংস্করণ)—সর্ব্বত্র উচ্চ প্রসংশিত মূল্য—১৷৹।

দেববালকের অমিয়ভোগ—বাংলা ভাষায় বালক বালিকাদের অপূর্ব্ব গল্প লহরী মোটা এন্টিক মনোরম বাঁধাই মূল্য—১৲।

সতী-সহচরী—বাংলার কূল বধূর সম্পূর্ণ উপযোগী, হিন্দু মুসলমান কুললক্ষ্মী হইয়া সংসারে গৃহ-শ্রী ফুটাইয়া তুলিতে পারে, মূল্য ৷৶৹।

ডাক্তার-পি, বানার্জ্জী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত।

সরল কবিতাছন্দে হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া-মেডিকা “**হোমিও-সুধা**” যন্ত্রস্থ। দুইশতাধিক ঔষধের লক্ষণ তত্ত্ব ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি এমনি সুন্দর ও সরল যে পাঠ-মাত্র লক্ষণাবলী কণ্ঠস্থ হইয়া যায়, মূল্য ৪৲।

দি বেজগাঁ রাজমোহন লাইব্রেরী।

চাটার্জ্জী—ব্রাদার্স

নারায়ণগঞ্জ (ইষ্টবেঙ্গল)